"পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্পে" গ্রন্থমালা

মহারাষ্ট্র

বহুবিধ গ্রন্থ-প্রণেতা।
শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু
প্রণীত

শিশির পাব্লিশিং হাউস
১৯৭ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি-এ,
শিশির পাবলিশিং হাউস
১১৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
—কলিকাতা—

মূল্য । মূল্য ২ টাকা [illegible]

প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল
মেট্‌কাফ্ প্রেস
১৫ নং নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বক্তব্য

ছেলেদের জন্য চিত্র ও গল্প মিশাইয়া ইতিহাস লেখা বড় কঠিন কাজ। এ ঠিক যেন মহোৎসবের মোহনভোগ প্রস্তুত করা। সুজী, চিনি, কিশ্‌মিশ্‌ অর্থাৎ ইতিহাস, গল্প ও চিত্র তিনটিই পরিমাণ মত দিতে হইবে—খুব বুঝিয়া-সমঝিয়া; একটু কমবেশীতেই হয় ত মস্ত ত্রুটি তৈয়ারী হইয়া যায়; ভোক্তার নিকট তেমন তৃপ্তিকর হয় না। ঘৃতের অংশটা আপাততঃ উহ্য রাখিয়াই গেলাম। ক্ষেত্র-বিশেষে অবশ্য তাহার পরিমাণ ও উৎকর্ষের তারতম্য ঘটে।

বস্তু-বাড়ী ভাল; মাল-মশল্লার অভাবও নাই। দুঃখের মধ্যে কেবল অপটু পাচক। মহারাষ্ট্রীয় সুজী দিয়া বাঙ্গলা দেশের রসনার উপযোগী মোহনভোগ প্রস্তুত করা যে-সে পাচকের কাজ নহে। যাহাহউক, প্রকাশকের নিকট যখন শোনা গেল যে, এই সিরিজের বইগুলি শুধু সুকুমারমতি ছেলে-মেয়েরাই পড়ে না, তাহাদের অভিভাবকগণও এগুলির দ্বারা অবসর-বিনোদন করিতে ভালবাসেন, তখন বইখানিকে সকল দিক দিয়া উভয় শ্রেণীর পাঠকের মনোজ্ঞ করিবার জন্য কিছু যত্ন লইতে হইল। সেইজন্য ইতিহাসের মাল-মশল্লা একটু বেশী সংবদ্ধ করিয়া, মিষ্টত্বের ভাগ কিঞ্চিৎ লঘু করিতে হইয়াছে।

চিত্র ও গল্পকে প্রাধান্য দিতে গিয়া অনেক সময় বাধ্য হইয়া মূল ইতিহাসকে খাটো করিয়া ফেলিতে হয়। মহারাষ্ট্র দেশ সম্বন্ধে তাহা করা চলে না—বিশেষতঃ যাহার ইতিহাসের অর্দ্ধেকটাই শিবাজীর মত একটা বিরাট চরিত্র জুড়িয়া রহিয়াছে। ইতিহাসখানিকে সংক্ষেপের মধ্যেও যথাসাধ্য প্রামাণিক করিবার জন্য উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সকল মহাজনেরই সাহায্য লওয়া হইয়াছে। চিনি ও কিশ্‌মিশ্‌ তাই বলিয়া একেবারে কম পড়ে নাই! ইতি—

কলিকাতা।
কার্ত্তিকী নবমী, ১৩৩৯।

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু।

সূচিপত্র

১ম অধ্যায়—	দেশ ও জাতির পরিচয়	১
২য় „	বিচ্ছিন্ন প্রাচীন ইতিহাস	১০
৩য় „	রাষ্ট্রকূট ও কল্যাণের চালুক্য বংশ	১৭
৪র্থ „	সেকালের শাসন-বিভাগ ও সমাজ-ব্যবস্থা ...	২২
৫ম „	মুসলমান আমলে যাদব রাজবংশ	২৮
৬ষ্ঠ „	বাহ্‌মানী সাম্রাজ্য	৩৫
৭ম „	আহ্‌মেদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা ...	৪৬
৮ম „	মুঘলযুগে মহারাষ্ট্র	৫৬
৯ম „	স্বাধীনতার বীজ-রোপণ	৭২
১০ম „	শিবাজীর স্বাধীনতা-সংগ্রাম	৮১
১১শ „	ছত্রপতি শিবাজী ...	১০৪
১২শ „	শিবাজীর রাজ্য-শাসন-প্রণালী ও শেষ জীবন ...	১২৬
১৩শ „	শিবাজীর বংশধরগণ	১৩৬
১৪শ „	পেশ্‌ওয়া-শাসন	১৪৬
১৫শ „	জীবন-সন্ধ্যায়	১৬২



ছত্রপতি শিবাজী।

[প্যারিসের Bibliotheque Nationalএ রক্ষিত একখানি প্রাচীন তৈল চিত্র হইতে]

মহারাষ্ট্র

প্রথম অধ্যায়

দেশ ও জাতির পরিচয়

কোন জাতির ইতিহাস জানিতে হইলে, প্রথমে তাহার দেশের ভৌগলিক অবস্থান ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লইতে হয়। তাই মহারাষ্ট্র জাতির ইতিহাস আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তোমাদিগকে একবার ভারতের মানচিত্রখানি খুলিয়া দেখিতে বলিব।

চাহিয়া দেখ, ভারতের বুকের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব দিকে মহানদী ও পশ্চিম দিকে নর্ম্মদা নদী প্রবাহিতা। ইহার দক্ষিণে যে বিরাট ভূখণ্ড পড়িয়া আছে, তাহার নাম দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিণাপথ। দক্ষিণাপথ অনেকটা ত্রিকোণাকার; ইহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম তীর ঘেঁষিয়া দুইটি প্রকাণ্ড পর্ব্বতশ্রেণী, প্রসারিত বাহুর মত বিস্তৃত হইয়া, সুদূর দক্ষিণে নীলগিরি পর্ব্বত পার্শ্বে আসিয়া শেষ হইয়াছে। পর্ব্বতমালার একটির নাম পূর্ব্বঘাট, অন্যটির নাম পশ্চিমঘাট বা সহ্যাদ্রি।

সহ্যাদ্রির পশ্চিম দিকে কুকুরের জিহ্বার মত এক প্রলম্বিত ভূমিখণ্ড পড়িয়া আছে; উহার নাম কঙ্কন। সহ্যাদ্রির পশ্চিম দিকে বহু ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালা উদ্ভব-লাভ করিয়া স্থানটিকে যেন পঞ্জরের মত করিয়া রাখিয়াছে। এই শাখা পর্ব্বতমালার সর্ব্বোত্তরেরটির নাম চন্দ্রমালা, সর্ব্বদক্ষিণেরটির নাম মহাদেও পর্ব্বত। প্রাচীনকালে মহারাষ্ট্র জাতির জন্ম হয় কঙ্কনে ও সহ্যাদ্রির এই শাখা-পর্ব্বতগুলির উপত্যকার মধ্যে।

তারপর কালক্রমে এই পার্ব্বত্য শিশু বৃদ্ধি পাইয়া, উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়ে। অবশেষে তাহার প্রতাপ এত বাড়িয়া পড়ে যে, অর্দ্ধ ভারতেও তাহার স্থান সঙ্কুলান হইল না! তাহার দাপটে ভারতের স্বদেশী বাদশাহ ও বিদেশী রাজ্য-জয়ীর দল থরহরি কাঁপিতে লাগিল—সে ইতিহাসের কথা—পরে বলিব।

এখন মহারাষ্ট্র দেশের মোটামুটি একটা চৌহদ্দী তোমাদিগকে জানাইয়া দিই। উত্তরে সাতপুরা ও গোয়ালগড় পর্ব্বতমালা; পূর্ব্বে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের পশ্চিমাংশ ও মাদ্রাজ প্রদেশের কিয়দংশ; দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা নদী ও দক্ষিণ কানারা; এবং পশ্চিমে আরব্য সাগর। মহারাষ্ট্র দেশের প্রায় সমস্তটাই বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত। নিজামের হায়দ্রাবাদ রাজ্যের সমস্ত পূর্ব্বাংশেই মহারাষ্ট্রদের বাস। মধ্যপ্রদেশের নাগপুর, সিউনি ও জব্বলপুরের সমস্ত পূর্ব্বভাগেও মহারাষ্ট্রীয়ের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। ব্রোচ, সুরাট ও রাজপিপলি প্রভৃতি কয়েকটি জেলা ছাড়া সাতপুরা ও

বিন্ধ্য পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী বেশীর ভাগ স্থান, এমন কি বিন্ধ্যের উত্তরে কয়েকটি জায়গা এবং বেরারের অধিকাংশ মহারাষ্ট্র জাতি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত।

কঙ্কন দেশটি সমুদ্র-জল-রেখা হইতে সহ্যাদ্রির পাদদেশ পর্য্যন্ত চওড়ায় পঁচিশ হইতে ত্রিশ মাইলের বেশী হইবে না; দুই চারি জায়গায় বড় জোর পঞ্চাশ মাইল হইবে। কঙ্কনের অধিকাংশ ভাগই সমতল নহে। সহ্যাদ্রির পূর্ব্ব দিকের ভূমিখণ্ড যে কতখানি অসমতল, তাহা তোমরা মানচিত্রখানির উপর একবার চক্ষু বুলাইলেই বুঝিতে পারিবে। দেশটি একেবারে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভরা। অবশ্য পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের উপর কতকগুলি বেশ প্রশস্ত মালভূমি আছে; ঐ গুলিকে মারাঠীরা 'ঘাট মাথা' বলে। মহারাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব্বে কতকটা জমি বেশ সমতল ও উর্ব্বর দেখা যায়। এইস্থানে তূলা উৎপন্ন হয়। দুই শাখা-পর্ব্বতের মাঝে মাঝে খানিকটা করিয়া উপত্যকা-ভূমি আছে, তাহাও বেশ উর্ব্বর। উহাতে ধান্য, জোনার প্রভৃতি ফসল ফলে।

সহ্যাদ্রির অধিকাংশ ভাগই ৩০০০ হইতে ৪০০০ ফুট উচ্চ এবং দুরারোহ। আমূল পর্ব্বতগাত্র নানারূপ বৃক্ষলতাপূর্ণ গভীর জঙ্গলে আবৃত। জঙ্গলে বাঘ-ভালুকের অভাব নাই। পর্ব্বতগাত্র দিয়া অসংখ্য সরিৎ ও ঝর্ণা অবিরাম বহিতেছে। এক এক স্থান বৃক্ষলতাবিরল ও জনমানবশূন্য। উত্তর ভারতের মত মহারাষ্ট্রদেশ শস্যশ্যামল ও ফল-ফসলে সমৃদ্ধ নহে। তবুও ব্রহ্মদেশের ন্যায় ইহার জলবায়ু বেশ উপভোগ্য ও অনেকটা অপরিবর্ত্তনীয়। বর্ষাকালে

এখানে প্রচুর বারিবর্ষণ হয়; তখন পার্ব্বত্য দৃশ্য সত্যই অতুলনীয়।

ক্ষুদ্র নদীর অভাব মহারাষ্ট্রদেশে নাই। পনেরো বিশ মাইল রাস্তা চলিতে গেলেই একটা না একটা স্রোতস্বতী পার হইতে হয়। এক দিকে প্রচুর পাহাড়ের ভীষণ কঠোরতা, অন্য দিকে বহুল প্রবাহিণীর মনোরম স্নিগ্ধতা—অপূর্ব্ব সম্মিলন! অধিবাসীদের দেহগুলিও হইয়াছে পর্ব্বতের ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু, হৃদয়গুলিও হইয়াছে নদীর মত সরস ও প্রাণপূর্ণ। সহ্যাদ্রি ও উহার শাখা-গিরিগাত্র হইতে ভীমা, নীরা (অথবা সীনা), কৃষ্ণা, গোদাবরী, তুঙ্গভদ্রা প্রভৃতি বড় বড় নদী জন্মলাভ করিয়াছে; তন্মধ্যে শেষের তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সর্ব্বোত্তরে বিরাটকায়া তাপ্তী নদী তাহার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা লইয়া বেরার প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া সুরাটের কোল ছুঁইয়া সাগরে পড়িয়াছে। নীরা ও মৌনী নামক ক্ষুদ্র নদী দুইটির উভয় তীরস্থ ভূভাগ প্রসিদ্ধ মারাঠী ঘোটকের জন্মস্থান। গোদাবরী নদী—দাক্ষিণাত্যের গঙ্গাস্বরূপা; মারাঠী হিন্দুরা ইহার জলকে সুপবিত্র জ্ঞানে পূজা করেন।

সমগ্র মহারাষ্ট্রদেশের আয়তন প্রায় এক লক্ষ বর্গ মাইল; অধিবাসীর সংখ্যা কিঞ্চিৎ কম দুই কোটি। অধিবাসীদের শতকরা আশী জনই হিন্দু। বাকী ভাগ মুসলমান, খৃষ্টান ও পার্ব্বত্য জাতি। মানচিত্রখানির প্রতি আবার দৃষ্টিপাত কর। জুনীর (জুন্নার) নামক একটি স্থান পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার ঠিক মাঝামাঝি

দেখিতে পাইতেছ কি? জুনীর হইতে দক্ষিণে কোলাপুর শহর পর্য্যন্ত যে মালভূমি ও পার্ব্বত্য ভূখণ্ডসকল আছে, তাহার মধ্যে বহু সংখ্যক মাওয়ালী, খোরা ও মুরা নামক তিনটি পার্ব্বত্য জাতি বাস করে। ইহাদের মধ্যে মাওয়ালী জাতির নাম সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইহারা যেমন কষ্টসহিষ্ণু, তেমনি সাহসী ও দুর্দ্ধর্ষ। শিবাজীর জীবন-কথায় ইহাদের কথা বিশেষভাবে জানিতে পারিবে। জুনীর হইতে উত্তরে সাতপুরা পর্ব্বতমালার সানুদেশ পর্য্যন্ত কোল্ ও ভীলদের বাসভূমি। ইহারাও খুব যুদ্ধপ্রিয়; শীকারে ও লুণ্ঠনে সমান ওস্তাদ।

মহারাষ্ট্রগণ আর্য্য ও দ্রাবিড় মহাজাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া অনেকেরই ধারণা। প্রথমতঃ সুরাষ্ট্রের শকরাজগণ উত্তর মহারাষ্ট্র জয় করিয়া লইয়া, অবাধে কিছুকাল পর্য্যন্ত দেশবাসীর সহিত বৈবাহিক আদান-প্রদান করে। শক, ইউচি প্রভৃতির সহিত আর্য্যরক্ত মিশিয়া রাজপুত জাতির সৃষ্টি; সেই রাজপুত জাতির রক্তও ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট মিশিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। তাহা ছাড়া, যদি পৌরাণিক উপকথায় বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, খাঁটি আর্য্য জাতির সহিত পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের দ্রাবিড়দের যথেষ্ট সাঙ্কর্য্য ঘটিবার সুযোগ ঘটিয়াছে।

উত্তরভারত নিঃক্ষত্রিয় করিবার পর, ব্রাহ্মণ পরশুরাম গোকর্ণ তীর্থ-দর্শনে আসেন। এই গোকর্ণ বর্ত্তমান বেলগামের দক্ষিণে অবস্থিত বলিয়া জানা যায়। তারপর তিনি ঋষি অগস্ত্যের

হত পশ্চিমঘাটে একটা আর্য্য উপনিবেশ ও সভ্যতার প্রবর্ত্তন করেন। কালক্রমে দুই সভ্যতার একটা মহামিলন ঘটিয়া, সম্ভবতঃ মহারাষ্ট্র জাতির জন্মদান করিয়াছে। তবে ভাষার দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে, ইহাদের দ্রাবিড় রক্তের প্রাবল্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে হয়। কারণ ইহাদের ভাষা পঞ্চ দ্রাবিড়ী ভাষার অন্যতম।

মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুগণ পুরাকালের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ত বটেই; তাহা ছাড়া বাংলা দেশের ন্যায় বহু সঙ্কর জাতিও ইহাদের সমাজে উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে নানা শ্রেণী আছে। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বেশীর ভাগই রাজপুত-জাত; বাকী কায়স্থ নামে পরিচিত। শূদ্রদের মধ্যে অধিকাংশই চাষাবাদ করে; ইহাদিগকে 'কুন্‌বী' বলা হয়। বিষ্ণু ও মহাদেব উভয় শ্রেণীর ভক্ত-সম্প্রদায়ই মহারাষ্ট্রে বর্ত্তমান।

উত্তর ভারতে মুসলমান ধর্ম্মের সহিত হিন্দু ধর্ম্মের যেমন চির-সংঘর্ষ চলিয়াছিল,—কোন সময় বা হিন্দুধর্ম্ম মুসলমান ধর্ম্মের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, কখনও বা ইস্‌লামধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে; ঠিক তেমন ব্যাপারটি কিন্তু মহারাষ্ট্র দেশে হয় নাই। একে ত মহারাষ্ট্র দেশ মুসলমান্ রাষ্ট্রীয় শক্তির অধীনে খুব অল্পকালই ছিল, তদুপরি এই ধর্ম্মের যেটুকু সারাংশ—তাহা মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুধর্ম্ম আপনার মধ্যে সহজ আনন্দের সহিত জীর্ণ করিয়া লইয়াছে। মুসলমান আগমনের পূর্ব্ব হইতে এখানে সমাজের উপর ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য কখনও ছিল না। বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে

সম্প্রদায়ে কচিৎ বিবাদ-বিসম্বাদ বা রেষারেষি হইয়াছে। শূদ্রজাত সাধু ও মহাপুরুষকেও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ ভক্তি করিতে কুণ্ঠা করেন নাই। বৈশ্য রাজার জন্য ক্ষত্রিয় বীরপুরুষগণ অকাতরে প্রাণবলি দিতে কার্পণ্য করেন নাই।

মহারাষ্ট্রীয় রমণীদের মধ্যে ঘোমটা বা পর্দা-প্রথা নাই ; দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ স্থানের ন্যায় সেখানে অবাধ স্ত্রী-স্বাধীনতা বিদ্যমান্। দুই শতাধিক বর্ষকাল মুসলমান সভ্যতার অব্যবহিত পার্শ্বে থাকিয়াও তাঁহারা রমণীর অবরোধ-প্রথাটি অনুকরণ করেন নাই। অবশ্য রাজা, মহারাজা, সভাসদ ও উচ্চশ্রেণীর সেনাধ্যক্ষগণ স্বীয় পরিবারের মধ্যে পর্দাপ্রথা কতকটা মানিয়া চলিতেন। পুরুষের সহিত নারীর সমান অধিকার ; পুরুষ নারীকে তাহার দাসী বলিয়া দেখে না—দেখে সহচরী ও মন্ত্রী বলিয়া। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, রাজপুত রমণীর চেয়েও তেজোবীর্য্যে মারাঠা রমণীগণ অধিকতর অগ্রণী। বর্তমানে শিক্ষা বিষয়েও মারাঠা রমণীগণ অত্যন্ত উৎসাহশীল। বস্তুতঃ কেবলমাত্র মেয়েদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ভারতে সর্ব্বপ্রথম মহারাষ্ট্র দেশেই (পুণায়) সম্প্রতি গড়িয়া উঠিয়াছে।

মহারাষ্ট্রদেশের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুরাতন শহর পুনা। বর্তমানে ইহা বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের গ্রীষ্মকালীন্ রাজধানী। এখানে ইংরাজ সৈন্যের প্রকাণ্ড ঘাঁটি আছে। বহুকাল ধরিয়া পুণা নগরী পেশওয়াদের রাজধানী ছিল। বম্বাই নগর পুনার

উত্তরপশ্চিমে কতকগুলি ক্ষুদ্র দ্বীপ লইয়া গঠিত বন্দর ; ইহাও মহারাষ্ট্র দেশের অন্তর্গত। বৃটিশ শাসনের প্রাক্কালেই ইহার প্রাধান্যের সূত্রপাত হয়। শহরের প্রায় বারো লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশ গুজরাতী ও পার্শী বণিক এবং নানা দেশীয় কর্ম্মচারী সম্প্রদায় ; তন্নিম্নেই সংখ্যা হিসাবে কচ্ছী, পাঠান ও মারাঠীদের স্থান। পুণা শহরের প্রায় ষাট মাইল দূরে, উত্তর-পশ্চিম দিকে, বোম্বাই শহরে প্রবেশ করিবার পথে কল্যাণ নামক প্রাচীন শহর অবস্থিত। ইতিহাস পড়িবার সময় আমা-দিগকে বহুবার কল্যাণকে স্মরণ করিতে হইবে।

মহাবালেশ্বর আমাদের দেশের দার্জ্জিলিংয়ের মত। পূর্ব্বে গভর্ণারগণ গ্রীষ্মের বেশীর ভাগ এখানেই কাটাইয়া যাইতেন। সাড়ে চারি হাজার ফুট উচ্চ পাহাড়ের শিখরদেশে শহরটি অবস্থিত। আহমেদনগর পুণা শহরের উত্তরপূর্বে অবস্থিত। ইহার চারিপার্শ্ব দিয়া একটা প্রতাপশালী রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। পুণার মাইল ষাটেক্ দক্ষিণে সাতারা নগর। ইহাও কিছুদিন মহারাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কেন্দ্রভূমি ছিল। উহার মাইল ষাটেক দক্ষিণে কোলাপুর শহর। তাহার নব্বই মাইল দূরে ঠিক পূর্ব্ব দিকেই প্রাচীন বিজাপুর নগর। ইহাকে ঘেরিয়াও একটা প্রকাণ্ড মুসলমান রাজ্য মাথা তুলিয়া দিল্লী-সম্রাটের রক্তচক্ষুকে একদিন উপেক্ষা করিয়াছিল। বিজাপুরের প্রাচীন সৌধ, তোরণ, প্রাসাদ ও মসজিদগুলি এখনও পর্য্যটকের বিস্ময়ের উপাদান যোগাইতেছে। উহার প্রত্যেকটার সহিত এক একটা ইতিহাস

জড়িত। পরে প্রসঙ্গক্রমে আহ্মেদনগর ও বিজাপুরের বিশদ পরিচয় দিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত, হিন্দুর প্রসিদ্ধ তীর্থ নাসিক ও পন্ধরপুর, তুলার বিরাট গঞ্জ হুব্‌লী, বেল্‌গম, শোলাপুর ও ধাড়্‌ওয়ার, রাজপুর, জিঞ্জীরা বন্দর প্রভৃতি স্থানগুলিও মানচিত্রে একবার দেখিয়া রাখা ভাল; হয়ত ইতিহাস পড়িতে পড়িতে পাঠককে অল্পবিস্তর এই সকল নামের সম্মুখীন্ হইতে হইবে।

—–*—–

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিচ্ছিন্ন প্রাচীন ইতিহাস

এক হাজার বৎসর আগেকার মহারাষ্ট্র সম্বন্ধে বড় বেশী খবর আমরা পাই না। 'গুর্সী' বলিয়া এখনও একটা নিম্নশ্রেণীর জাতি মহারাষ্ট্রের স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাদের মধ্যে অনেকেরই বেশ সুর-স্বর ও বাদ্য সম্বন্ধে জ্ঞান আছে। লোকপ্রবাদ ও কিংবদন্তী দ্বারা যতখানি জানা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, এই গুর্সীরাই মহারাষ্ট্রের আদিম অধিবাসী। তাহার পর কোল, ভীল প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতিরা ত ছিলই। ইহারা সকলেই অনার্য্য দ্রাবিড়। উত্তরভারতে আর্য্যজাতির প্রাধান্য-বিস্তারের সময়, দ্রাবিড় ও তাঁহাদের মধ্যে বহু কালব্যাপী যে যুদ্ধ চলে, তাহার ফলে বহু দ্রাবিড় নর্ম্মদা ও তাপ্তী নদীর দক্ষিণে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। আর্য্যগণ ঈর্ষাবশতঃ ইহাদিগকে অনার্য্য-রাক্ষস বলিয়াছেন বটে; কিন্তু যুদ্ধ-বিদ্যায়, অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারে এবং যুগোপযোগী সভ্যতায় দ্রাবিড়গণ যে আর্য্যগণ অপেক্ষা খুব নীচে ছিলেন, একথা কিছুতেই বলা চলে না।

অনুমান করিয়া বলা যায় যে, মহারাষ্ট্র দেশ তখন বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বা জনপদে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক জনপদের একজন করিয়া সর্দ্দার বা নেতা ছিলেন। ইঁহাকে রাজা বলিলেও ক্ষতি নাই, তবে মধ্যযুগের রাজার ন্যায় ইঁহারা যথেচ্ছাচার

করিতে পারিতেন না। এই ক্ষুদ্র রাজাদের মধ্যে একটি রাজ্য বোধ হয় যীশু খৃষ্ট জন্মাইবার দুই শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বেশ একটু প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, এবং তাহার বিখ্যাত রাজধানী তাগারার নাম সমসাময়িক গ্রীক্ ইতিহাসেও স্থান লাভ করিয়াছে।

তারপর যীশু খৃষ্টের জন্মের শত অনেক বৎসর পূর্ব্বে শালিবাহন নামক এক রাজার সন্ধান পাওয়া যায়। ইনি শুধু উত্তর মহারাষ্ট্র নহে, পশ্চিমে অন্ধ্র রাজ্যের কিয়দংশও গ্রাস করিয়াছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে অনেক কাহিনী বা উপকথা মহারাষ্ট্র দেশে প্রচলিত আছে; তাহার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কতটা আছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। যাহা হউক, শালিবাহনের পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বভাগে গোদাবরী ও কাবেরী নদীর মধ্যস্থলে অন্ধ্র জাতি শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। খৃষ্ট জন্মাইবার দুই শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পরে, অন্ধ্রগণ মহারাষ্ট্র দেশ অধিকার করিয়া লইয়া, তাহাদের রাজ্যের দুই সীমা দুই সাগরোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত করে *।

শালিবাহন খুব ছোট ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ বলেন—তিনি কুনবীর (চাষার) ঘরে, কেহ বলেন—তিনি কুমারের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার কেহ বলেন, তিনি ব্রাহ্মণ বংশজাত। তাঁহার মাতা কুমারী অবস্থায় এক সর্পরূপী দেবতার কৃপায় গর্ভবতী হন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সমাজচ্যুত হওয়ার ভয়ে কন্যাকে

* "Student's History of India"—Smith, p. 70.

গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেন। এক কুম্ভকার সেই আসন্নপ্রসবা ব্রাহ্মণ-কন্যাকে নিজ গৃহে আশ্রয় দেন। এইখানেই শালিবাহনের জন্ম ও বাল্য জীবন-যাপন।

শালিবাহন ক্রমশঃ বড় হইয়া মহাবলশালী যোদ্ধায় পরিণত হইলেন। তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি হইল যেমন অগাধ, রাজ্যজয়ের ইচ্ছা হইল তেমনি অনন্ত। নর্মদা নদীর দক্ষিণস্থ সমস্ত রাজ্যকে পরাস্ত করিয়া, তিনি দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত আপন আধিপত্য বিস্তার করেন। শালিবাহন প্রীতিস্থানে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন! ইহাকেই গ্রীক্ পেরিপেলাস্ 'পাইথান্' নগর বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পশ্চিমে গোদাবরীর তীরে এখনও পৈথান বলিয়া একটি ক্ষুদ্র নগর দেখা যায়। তিনি সূর্য্য-বংশীয় আশ্ শীর নামক স্থানের অধিপতিকে রাজ্যচ্যুত করেন এবং তাঁহার পরিবারের সকল স্ত্রী-পুরুষকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করেন।

কেবল একটিমাত্র গর্ভবতী মহিলা সাতপুরা পর্ব্বতের এক দুর্গম স্থানে গিয়া কোন ভীলের কুটিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে যে সন্তান জন্মে, তাহারই পরপুরুষগণ নাকি চিতোর ও উদয়পুরের বিখ্যাত রাণাবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। শালিবাহন মালবরাজ বিক্রমজিতের সহিত বহুদিন ধরিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে সম্মানজনক সর্ত্তে উভয়ের মধ্যে সন্ধি হয়। খৃঃ পূঃ ৭৮ সালে শালিবাহন এক নূতন শক প্রচলিত করেন। ঠিক ঐ সালেই উত্তর ভারতে কুশান্ বংশীয় নৃপতি দ্বিতীয় ক্যাড্ফাইসেস্-এর অভিষেক-সময়ে শকাব্দও প্রচলিত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অন্ধ্রগণ পরাক্রান্ত হইয়া মহারাষ্ট্রদেশ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লইয়াছিল। অন্ধ্রদেশে যে রাজবংশের প্রায় বত্রিশজন রাজা ২৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় চারিশত বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম সাতবাহন বংশ। ইঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন; কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ন্যায় যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজ্যশাসন করিতেন বলিয়া ইঁহারা আপনাদিগকে ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত করিতেন। ইঁহাদের ধান্যকটক নামক স্থানে রাজধানী ছিল। সম্ভবতঃ অন্ধ্রদেশীয় এই সাতবাহন বংশীয় কোন রাজাকেই শালিবাহন পরাস্ত করিয়া, মহারাষ্ট্রদেশ স্বাধীন করিয়াছিলেন।

ইহার পর শক ও ইউচি উত্তর ভারতের অধিকাংশ জয় করিয়া লইয়া এক বিরাট রাজ্য পত্তন করেন। ইউচিদের প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী রাজা ছিলেন কুষাণবংশীয় কনিষ্ক। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমরা দেখিতে পাই যে, মালব, গুর্জ্জর, মিথিলা ও সুরাষ্ট্রে চারিজন শকজাতীয় শাসনকর্ত্তা পুরুষপুর বা পেশোয়ারের কেন্দ্রীয় শক-সম্রাটের প্রতিনিধি-স্বরূপ অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। এই শাসন-কর্ত্তাদের উপাধি ছিল ক্ষত্রপ (satrap),—এখন ইংরাজীতে 'গভর্ণার' বলিলে যাহা বুঝি। কিছুকাল উত্তর-মহারাষ্ট্রও শকদের অধীন ছিল। মহারাষ্ট্রের প্রথম ক্ষত্রপের নাম ছিল নাহাপনা। ইনি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের উন্নতি সাধনে যথেষ্ট যত্নবান হইয়াছিলেন *।

শক বা কুষাণদের সহিত অন্ধ্রদের বরাবরই যুদ্ধ-বিগ্রহ

* "ভারতবর্ষের ইতিহাস"—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী; ৩৯ পৃষ্ঠা।

চলিতেছিল। তারপর সমগ্র ভারতে কুষাণবংশীয়দের আধিপত্য লোপের সঙ্গে সঙ্গে, অন্ধ্রদের হৃতগৌরব কতকটা ফিরিয়া আসিল বটে; কিন্তু বিখ্যাত সাতবাহন বংশের চিরতরে পতন হইল। ইহার পর প্রায় তিন শতাব্দী পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাস একেবারে নীরব। তারপর ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাষ্ট্রীয় চালুক্যবংশ দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গড়িয়া তুলিলেন। ইঁহারা আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত করিতেন।

চালুক্যগণ প্রতাপশালী হইয়া ক্রমশঃ উত্তরে, দক্ষিণে ও পূর্ব্বে তাঁহাদের অধিকার-সীমার বিস্তার করিতে লাগিলেন। এমন সময় পল্লবদিগের সহিত তাঁহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। পল্লবগণ পঞ্চম শতাব্দীতেই কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর মধ্যভাগে পূর্ব্বসমুদ্র-কূল ঘেঁষিয়া একটি রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাদের দুইটি রাজধানী ছিল, একটি পশ্চিমে বাতাপীনগর বা বাদামী এবং অন্যটি পূর্ব্বে কাঞ্চী (মাদ্রাজ শহরের কয়েক মাইল দক্ষিণে বর্ত্তমান 'কঞ্জীভরম্')। পল্লবদের সময়েই অনেক বড় বড় দেব-মন্দির কাঞ্চীতে নির্ম্মিত হয় এবং উহা অন্যতম মহাতীর্থ বলিয়া ঘোষিত হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণ ভারতের প্রাধান্য লইয়া চালুক্য ও পল্লবদিগের মধ্যে মারামারি বেশ পাকাইয়া উঠিল। চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য পল্লবদিগের পূর্ব্বদিকস্থ রাজধানী কাঞ্চীনগরী আক্রমণ ও অবরোধ করিয়া বসিলেন। অবশেষে পল্লবগণ রাজধানীর সিংহদরজা খুলিয়া দিয়া, তাঁহার নিকট আত্ম-সমর্পণ করেন। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ বিক্রম কাঞ্চীর

কোন ক্ষতিসাধন করেন নাই; উঁহার দেবমন্দিরগুলি অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন।

তারপর চালুক্যরাজ্য পুলকেশী পল্লবদের পশ্চিমদিকস্থ রাজধানী বাদামী ক্রমাগত আক্রমণ করিয়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেন। উহার নিকট তাঁহার নূতন রাজধানী তৈয়ারী হয়।

তাঁহার বংশধর দ্বিতীয় পুলকেশী মহাপরাক্রান্ত ছিলেন; তাঁহার রাজদণ্ডের নীচে সমস্ত দক্ষিণী নৃপতিগণ মাথা নোয়াইয়াছিল। উত্তর ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্ তখন রাজা হর্ষবর্দ্ধন,—তাঁহার জয়খ্যাতিতে তখন আকাশ-বাতাস ভরিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পুলকেশী এক বিরাট বাহিনী লইয়া কোণ্ডোন্নমণ্ডল (বর্ত্তমান্ নিজাম রাজ্যের পশ্চিমাংশ) অতিক্রম করিয়া, কলিঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হর্ষবর্দ্ধনের সৈন্যদলকে ভীষণভাবে পরাস্ত করিয়া, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর তাঁহার হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইলেন (অনুমানিক ৬২০ খৃঃ)। তারপর তিনি হর্ষের মহিমা ম্লান করিয়া দিয়া মালব ও গুজরাট অধিকার করেন। পল্লবদের প্রতিবেশী চোল, চের (কেরল) ও পাণ্ড্য রাজাদেরও তিনি শায়েস্তা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। চীনা পরিব্রাজক ইউয়ান্ চোয়াঙ্ ইঁহার রাজসভায় কিছুদিন ছিলেন; তিনি পুলকেশীর রাজ্যশাসন ও তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু পল্লবগণ দ্বিতীয় পুলকেশীর অধীনতা বেশীদিন স্বীকার করিয়া চলিল না। কয়েক বৎসর পরে পল্লবরাজ নরসিংহ বর্ম্মা

বৃদ্ধ পুলকেশীকে কেশে ধরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে টানিয়া আনিলেন। যুদ্ধে পুলকেশী পরাজিত ও নিহত হইলেন এবং তাঁহার রাজধানী শত্রুদল কর্তৃক লুষ্ঠিত হইল। কিছুদিন পরে পুলকেশীর সুযোগ্য পুত্র দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য পল্লবদিগের উপর প্রাণ ভরিয়া প্রতিশোধ লইলেন এবং চালুক্যদের বিজয়লক্ষ্মীকে স্বীয় রাজধানীতে পুনরায় ফিরাইয়া আনিলেন। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত চালুক্যগণ নির্ভাবনায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তারপর রাষ্ট্রকূটগণের অভ্যুদয় হইল।

তৃতীয় অধ্যায়।

রাষ্ট্রকূট ও কল্যাণের চালুক্য বংশ।

প্রাচীনকাল হইতেই মহারাষ্ট্র দেশে 'রট্টা' নামক এক জাতির বসতি ছিল। ইহারা দ্রাবিড় জাতি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আর্য্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া, যখন মহারাষ্ট্রে চতুর্ব্বর্ণ বিভাগের প্রয়োজন হইল, তখন রট্টাগণের অধিকাংশ ক্ষত্রিয় শ্রেণীতে উন্নীত হইল। পরবর্ত্তী কালে রট্টাগণ যখন প্রতাপশালী হইলেন, তখন আপনাদিগকে মহারট্টা বলিয়া প্রচার করিলেন। মহারট্টা হইতে সংস্কৃতে 'মহারাষ্ট্র' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মহারট্টাগণের এক সর্দ্দার রাষ্ট্রকূট রাজবংশের পত্তন করিলেন। ইঁহারা তাম্রশাসনে আপনাদিগকে 'রাষ্ট্রকূট ও যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন *। এই জন্য ইঁহাদের বহু ব্যক্তির নামের সহিত কৃষ্ণ-নাম সংযুক্ত।

মহারট্টাগণকে মৌর্য্য-সম্রাট অশোকের সময়েও (খৃঃ পূঃ ২৫০) তাপ্তী নদীর দক্ষিণ তীরে ও সাতপুরা পর্ব্বতমালার প্রান্তভাগে দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাষ্ট্রকূট বংশ বর্ত্তমান হায়দ্রাবাদের অধিকাংশ ভূমি

* "Early History of the Deccan"—R. G. Bhandarkar. —p. 62.

অধিকার করিয়া, একটি শক্তিশালী রাজ্য-গঠনের সূত্রপাত করিলেন। ইঁহাদের রাজধানী হইল মাল্যক্ষেত। বর্ত্তমান নিজাম্‌-রাজ্যের রাজধানী হায়দ্রাবাদের অনতিদূরে মাল্‌খেড্‌ নামক গণ্ডগ্রামখানি এখনও রাষ্ট্রকূটরাজদের সেই প্রাচীন রাজধানীর নাম বহন করিয়া আসিতেছে। মাল্যক্ষেতের প্রতিষ্ঠাতার নাম দন্তিবর্ম্মা। নিজাম-রাজ্যের ইলোরা নামক পর্ব্বতগুহার মধ্যে যে দশাবতার মূর্ত্তি আছে, তাহার নীচে দন্তিবর্ম্মার নাম ক্ষোদিত আছে *।

দন্তিবর্ম্মার পূর্ব্বেও দুই একজন রাষ্ট্রকূট রাজার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইঁহাদের সহিত চালুক্য রাজাদের দুই চারিটি যুদ্ধও হইয়াছিল। ইন্দ্র নামক রাষ্ট্রকূটরাজ বহু সহস্র সৈন্য ও আট শত রণহস্তীর মালিক ছিলেন; চালুক্যরাজ প্রথম জয়সিংহ তাঁহাকে বহু কষ্টে হটাইয়া দেন।

৭৫৩ খৃষ্টাব্দে দন্তিবর্ম্মার সুযোগ্য বংশধর দন্তিদুর্গ চালুক্য-বংশের শেষ রাজার সহিত এক প্রকাণ্ড কুরুক্ষেত্র সুরু করিয়া দিলেন। চালুক্য-রাজ যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিলেন। চালুক্য-দিগের সমস্ত রাজ্য রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিদুর্গের পদানত হইল। চালুক্যরাজকে উত্তর কঙ্কনের খানিকটা অংশে করদ রাজা করিয়া রাখা হইল। অল্পদিনের মধ্যেই রাষ্ট্রকূটগণ সমগ্র দাক্ষিণা-ত্যের রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া উঠিলেন।

এইবার দুই একজন রাষ্ট্রকূট নৃপতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

---

* "Bombay Gazetteer", Vol. I, part I, p, 120.

দন্তিদুর্গের কোন ছেলেপুলে ছিল না বলিয়া, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার খুড়া প্রথম কৃষ্ণ মাল্যক্ষেতের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই সময় গৌড়বঙ্গে পুনঃ পুনঃ অন্যদেশীয় নৃপতিগণ অভিযান করিতেছিলেন। গুর্জ্জর প্রতীহারবংশীয় শ্রীবৎসরাজ কান্যকুব্জ (বর্ত্তমান কনোজ) জয় করিয়া লইয়া, গৌড়বঙ্গ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন।

রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম কৃষ্ণের দ্বিতীয় পুত্র ধ্রুবধারাবর্ষ শ্রীবৎসরাজকে গৌড়বঙ্গ হইতে তাড়াইয়া দিয়া, নিজেই গৌড়বঙ্গ-বিজয়ী নাম ক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি কলিঙ্গ ও কোশল রাজগণকেও পরাস্ত করিয়া সম্রাট্ নাম গ্রহণ করেন। ইহা ব্যতীত পল্লবগণ কাঞ্চীর চতুষ্পার্শে যেটুকু ভূমি লইয়া তখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন, ধ্রুবধারার সৈন্যদলের পদভারে তাহাও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ধ্রুবধারার পুত্র তৃতীয়-গোবিন্দ প্রভূতবর্ষ তারপর মাল্যক্ষেতের সম্রাট্ হন্।

এইভাবে তের পুরুষ রাজত্ব করিবার পর রাষ্ট্রকূট বংশীয়দের পতন হইল। ইঁহারা সকলেই বিষ্ণু ও শিবের উপাসক ছিলেন। ইলোরার প্রসিদ্ধ গুহাসমূহ এতকাল বৌদ্ধযুগের ভাস্কর্য্য ও তক্ষণ-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের মহিমা বহন করিতেছিল; রাষ্ট্রকূটগণ সেগুলিকে হিন্দু ভজনালয়ে পরিণত করিয়া, বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি ও পৌরাণিক কাহিনী ক্ষোদিত করাইয়াছিলেন।...

উত্তর কঙ্কনে চালুক্যগণ এতদিন হীনবীর্য্য সামন্তরূপে

কোনমতে টি^কিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই এক বংশ দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে নববলে বলীয়ান্ হইয়া, কল্যাণে রাজধানী স্থাপন করিলেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া রাজ্য-বিস্তারের বিরাট আয়োজন ফাঁদিয়া বসিলেন। ইঁহাদের একদল গুজরাটে গিয়া চওড়া বংশীয় সামন্তসিংহকে পরাস্ত করিয়া, সেখানকার সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। চওড়াবংশীয় রাজারা অন্‌হিলপত্তন নামক স্থানে তাঁহাদের নূতন রাজধানী পত্তন করিয়াছিলেন। এইখানে চালুক্য-নায়ক মূলরাজ রাজা হইয়া (৯৪৩ খৃঃ), সমগ্র গুজরাট ও রাজপুতানার দক্ষিণ-পশ্চিমের খানিকটা ভূভাগের উপর প্রভুত্ব করিতে থাকেন।

ইঁহার বংশধর ভীমদেবের রাজত্ব সময়ে গজনীর সুলতান মাহ্‌মুদ রাজপুতনার মরুভূমির মধ্য দিয়া অন্‌হিলপত্তনে আসিয়া উপস্থিত হন্। রাজা হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া, দলবল লইয়া সোম-নাথের দিকে পলায়ন করিলেন। সেখানে সামন্তরাজাদের জুটাইয়া লইয়া, সুল্‌তান্ মাহ্মুদকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। তারপর সুলতান মাহ্‌মুদ সেস্থানে পৌঁছিয়া, হিন্দুদের সহিত তিন দিন ধরিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন। সোমনাথের পুরোহিতগণ পর্যন্ত যুদ্ধে যোগ দিলেন; তাঁহাদের পত্নীরাও অন্দর-মহলের অর্গল্ ভাঙ্গিয়া মৃত্যুমুখর যুদ্ধ রণাঙ্গণে আসিয়া স্বামিপুত্রদের উৎসাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে হিন্দুরা হটিয়া গেলেন। সুল্‌তান কয়েকদিন ধরিয়া সোমনাথের

প্রসিদ্ধ মন্দিরের অগাধ ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া, স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার পিছু ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই চালুক্যগণ আবার গুজরাটে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেন এবং সোমনাথের মন্দির পুনরায় নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ইহার পর ভীমরাজ ভোজ-দেবকে পরাস্ত করিয়া, ধারানগর অধিকার করিয়াছিলেন; শেষ বয়সে তিনি একবার সিন্ধুদেশেও অভিযান করেন।

কুমার পাল গুজরাতী চালুক্যবংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁহার প্রভাব দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ১১৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মোহাম্মদ ঘোরী গুজরাট্ আক্রমণ করেন বটে, কিন্তু কুমারপালের শৌর্য্যে নিতান্ত শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি লইয়া ফিরিয়া আসেন। তারপর কুমারপালের উত্তরাধীকারীরা ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, মুসলমানগণ পুনঃ পুনঃ গুজরাটের দ্বারে আসিয়া হানা দিতে লাগিলেন। একবার কুৎবুদ্দিন আইবেক্ বহু সৈন্য লইয়া গুজরাট আক্রমণ করিলে, চালুক্যদের সামন্ত-রাজ ও জ্ঞাতি লবণপ্রসাদ ভীম বিক্রমে তাহাদিগকে প্রতিহত করিয়াছিলেন। তাহার পর লবণপ্রসাদের বংশধরগণই প্রায় শত বর্ষ গুজরাট সিংহাসনের শোভা বর্দ্ধন করেন। অবশেষে আলাউদ্দিন খাল্‌জীর সময়ে গুজরাটের হিন্দুস্বাধীনতা লুপ্ত হইয়া যায়। লবণপ্রসাদ প্রথমে ব্যাঘ্রপল্লীর জায়গীরদার ছিলেন বলিয়া তাঁহার বংশ বাঘেলা বংশ বলিয়া পরিচিত। চালুক্য ও বাঘেলা বংশের অনেকেই জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহাদের অহিংসা নীতির বাড়াবাড়িই বোধহয় রাষ্ট্রীয় অধঃপতনের অন্যতম কারণ *।

এদিকে কল্যাণের অন্য একদল চালুক্য রাষ্ট্রকূটদের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিতে করিতে, তাঁহাদের রাজ্য-সীমা একটু একটু করিয়া বাড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। অবশেষে ৯৭০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় তৈল-চালুক্যের নিকট রাষ্ট্রকূটগণ একেবারে পরাভূত হইয়া, ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ হইতে চিরকালের জন্য সরিয়া পড়িলেন +। এই সময়ে গৌড়বঙ্গে বিখ্যাত সম্রাট্ মহীপাল রাজত্ব করিতেছিলেন। এই নূতন চালুক্য বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন (১০৭৬—১১২৬ খৃঃ অঃ)। তিনি একবার তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্ব-সময়ে, গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়া রাঢ়দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কতকগুলি রাজ্য জয় করিয়া লন। কিন্তু এই অধিকার বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। পরবর্ত্তী চালুক্যরাজগণ ক্রমশঃ হতবল হইয়া পড়েন এবং দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইঁহাদের প্রাধান্য লোপ পায়।

---

* ভারতবর্ষের ইতিহাস—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ৬৭ পৃষ্ঠা।

\+ "Early History of the Deccan"—Bhandarkar P. 79

চতুর্থ অধ্যায়

সেকালের শাসন-বিভাগ ও সমাজ-ব্যবস্থা

হিন্দু আমলে সমাজ ও রাষ্ট্রের সহিত বরাবরই একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ছিল। কেহ কাহাকেও অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে পারিত না, আবার কেহ কাহারও উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেও পারিত না। রাজধানীতে রাজার স্থায়ী বাস হইলেও, গ্রামগুলি তাঁহার সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধান হইতে বঞ্চিত থাকিত না। প্রত্যেক গ্রামখানির সহিত তাঁহার যোগসূত্র ছিল। নগরের সহিত গ্রামের নিত্য আদান-প্রদান চলিত। একমাত্র রাজ-কর্ম্মচারী, সৈন্য-সামন্ত ও বড় বড় ব্যবসাদার ছাড়া তখন নগরে আর কেহ স্থায়ীভাবে বসবাস করিত না। চাকুরীর লোভ ও বিলাসিতার মোহ তখন গ্রাম হইতে এমন দলে দলে লোক টানিয়া আনিত না।

প্রত্যেক গ্রামখানি ছিল যেন এক একটি ছোটখাট রাজ্য। প্রত্যেক গ্রামের সীমা নির্দ্ধারিত থাকিত এবং গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তির জমির একটা চিহ্নিতনামা ও তালিকা থাকিত। কৃষক শ্রেণী ছাড়া প্রত্যেক বড় বড় গ্রাম আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হইবার জন্য আরও কতকগুলি শ্রেণীকে আপন বক্ষে স্থান দিত। এই শ্রেণীগুলি প্রথমতঃ পেশাগত ও পরিবর্ত্তনীয় ছিল; পরে জাতিগত হইয়া যায়।

উত্তর মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের গ্রাম্য মাতব্বরের নাম 'পাটেল্'; মুসলমান আমলে ইঁহাদের 'নাম হয় 'মোকদ্দম'। হিন্দু নীতিশাস্ত্রে ইহাদিগকে 'গ্রামাধিকারী' বলা হইত। ইঁহারা গ্রাম্য সমাজের কর্ত্তা ও শাসন-বিচারের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। মামলা-মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি সাধারণতঃ পঞ্চায়েৎ প্রথায় হইত। এই পঞ্চায়েতে অনেক সময় পাটেলই সভাপতিত্ব করিতেন। কিন্তু গুরুতর ফৌজদারী অপরাধে পাটেলগণ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট অপরাধীকে পাঠাইয়া দিতেন। 'চৌগুলা' ও 'কুলক্রানি' সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। পাটেলরা প্রায়শঃ শূদ্র অথবা ক্ষত্রিয় জাতির মধ্য হইতেই নির্ব্বাচিত হইতেন। কঙ্কন প্রদেশের বহুস্থলে 'খোট্' নামক আদিম কৃষিজীবীদের মধ্য হইতেই সর্দ্দার বা পাটেল্ নির্ব্বাচিত হইত।

'কুলক্রানি' ছিলেন যেন গ্রাম্য রাজার গ্রাম্য মন্ত্রী। গ্রামের লোকসংখ্যা, জন্মমৃত্যু, জমিজমার হিসাব-পত্র রাখা, গ্রাম্য-শাসনে পাটেলকে পরামর্শ দেওয়া ছিল ইঁহাদের প্রধান কাজ। ইঁহারা খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করিতেন এবং প্রতি কিস্তির খাজনা আদায় লইয়া, পাটেলের মারফৎ রাজ-তহবিলে নিয়মিত পাঠাইয়া দিতেন। কুলক্রানিদিগকে কোন কোন প্রাচীন পণ্ডিত 'গ্রাম্যলেখক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণই সাধারণতঃ এই পদে বসিতেন।

সাধারণতঃ ফসলের এক ষষ্ঠাংশ রাজকর স্বরূপ আদায় করা

হইত। সময় বিশেষে ও বিশেষ বিশেষ রাজার অভিরুচি হিসাবে এক চতুর্থ বা এক পঞ্চমাংশও আদায় হইত ফসল বা ফসলের ন্যায্য দাম পাটেল-সরকারে জমা দেওয়া চলিত। খাজনা ছাড়া বিক্রেয় পণ্যের উপর অথবা বিদেশী পর্য্যটকের উপরও একপ্রকার শুল্ক ধরা হইত।

'চৌগুলা' ছিলেন 'বাড় বালোতে' ও 'বাড় আলোতে' সম্প্রদায়ের মুখপাত্র ও সর্দ্দার। এই সম্প্রদায় দুইটির ভিতরকার শৃঙ্খলা ও নৈতিক চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখা ও তাহাদের অভাব-অভিযোগ পাটেলের গোচরীভূত করা ছিল চৌগুলার প্রধান কর্ত্তব্য। প্রত্যেক গ্রামের পাটেল্, কুলকার্নি ও চৌগুলা গ্রামের সমস্ত জমির পঁচিশ ভাগের একভাগ নিষ্করভাবে উপভোগ করিতে পাইতেন; তাঁহাদের পৃথক মাহিনা ছিল না। সাধারণতঃ এই পদগুলি পুরুষানুক্রমিক ছিল।

প্রত্যেক গ্রামের বাড় বালোতের মধ্যে বারোটি শ্রেণী বা জাতির এক একটি পরিবার থাকিত; বাড় আলোতের মধ্যেও ঠিক ঐরূপ। বাড় বালোতের অন্তর্গত বারোটি জাতির নাম:—(১) সূত্রধর বা ছুতার। (২) কর্ম্মকার। (৩) মুচী ও চর্ম্মকার। (৪) 'মাহর' বা 'ধের্'—গ্রাম্য চৌকিদার ও চর; ইহারা বেশ বুদ্ধিমান ও সাহসী ছিল। (৫) 'মাঙ্'—ইহারা মাহরদের তাঁবে কার্য্য করিত; কেহ কেহ চাবুক, লাগাম প্রভৃতি চামড়ার জিনিষ প্রস্তুত করিত; সদুপায়ে জীবিকার্জ্জনের সুবিধা না থাকিলে চুরী ও ডাকাতিয়া গুণ্ডার কার্য্য করিত। ইহারা বোধ হয় পরবর্ত্তী

কালে ঘেসেড়া, মেথর ও ধাঙ্গড়ের কার্য্য করিত। (৬) কুম্ভকার। (৭) নাপিত। (৮) ধোপা। (৯) 'গুরো'—ইহারা লোকের গহনাপত্র পরিষ্কার করিয়া দিত, দেব-মন্দিরের বাসনপত্র মাজিত ও পূজার সময়ে ঢাক ঢোল বাজাইত। যুদ্ধকালে ইহারা কাড়া-নাকাড়া বাজাইবার জন্যও নিযুক্ত হইত। (১০) 'যোশী'—গ্রাম্য জ্যোতিষী; ইঁহারা পূজা পার্ব্বণের দিন নির্দ্ধারণ করিয়া ও জাতকের কোষ্ঠি প্রস্তুত করিয়া দিতেন। ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ বংশসম্ভূত হইতেন। (১১) 'ভাট' অর্থাৎ গ্রাম্য চারণ; গ্রামের কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ করিয়া ইঁহারা গান বাঁধিতেন। (১২) 'কাটিক্'—ইহারা দেব-মন্দিরের বলি কাটিত, নচেৎ বাজারে মাংস বিক্রয় করিত। আজকালকার কশাই শ্রেণীর মত। এই সঙ্গে মুসলমান আমলে 'মোল্লা' যুক্ত হন্।

বাড় আলোতের বারোটি জাতির নাম যথাক্রমে :—(১) 'সোনার' অর্থাৎ স্বর্ণকার। (২) জঙ্গম অর্থাৎ লিঙ্গায়েৎ নামক উপাসক সম্প্রদায়ের গুরু; (৩) 'শিম্পী' বা দর্জ্জী; (৪) 'কোলী' বা কোল্ জাতীয় জল-বাহক। পরে ইহারা সর্ব্বপ্রকার জিনিষই বহনাবহন করিত। কোলী হইতে সম্ভবতঃ 'কুলী' শব্দের রেওয়াজ্ হইয়াছে। (৫) 'তুরাল্'—বর্ত্তমান গ্রাম্য দফাদার বিশেষ। ইহারা বিদেশী অতিথিদের সম্বর্দ্ধনা করিত, তাহাদিগের খাদ্যা-বাসের সুব্যবস্থা করিয়া দিত এবং বিদেশীদের গতিবিধি সম্বন্ধে পাটেলকে নিয়মিত সংবাদ দিত। (৬) মালী। (৭) গোঁসাই বা পুরোহিত। (৮) গুর্সী বা বংশীবাদক; (৯) 'রামুশী'

বা গ্রামবাসী ভীল ; ইহারা খান্দেশ জেলার মধ্যে ও সহ্যাদ্রির উত্তর ভাগে বহু সংখ্যায় বসতি স্থাপন করিয়াছিল। গ্রাম্য চৌকিদার, বা পাহারাওয়ালার কার্য্যে ইহারা সবিশেষ কার্য্যকরী হইত। (১০) তেলী; (১১) তাম্বুলী ; ও (১২) 'গণ্ডুলী' বা বাদ্যকার। ইহারা বিবাহাদি উৎসবে ঢোলক বাজাইয়া গাহিত ও নাচিত।

পাঁচটি বড় অথবা পঁচিশটি ছোট মৌজা বা গ্রাম লইয়া একটা 'কশ্‌বা' (আজকালকার থানার মত) সৃষ্ট হইত এবং কতকগুলি কশ্‌বা লইয়া একটা 'দেশ' গঠিত হইত। এক একটা দেশ আজকালকার পরগণার চেয়ে সচরাচর বড় হইত না। দেশের কর্ত্তার নাম ছিল 'দেশমুখ' অথবা 'দেশাই'—অনেকটা মুসলমান্ আমলের জমিদারের মত। ইহাদের দেওয়ান্ বা উজীরের মত ছিলেন 'দেশপাণ্ড্য' বা দেশলেখকগণ। প্রায় ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণগণ এই পদ অধিকার করিতেন ; সেইজন্য আজকাল এক্ শ্রেণীর মারাঠী ব্রাহ্মণদের জাতিগত উপাধি দেশপাণ্ডে।

দেশমুখগণ পাটেলদের নিকট নিয়মিত খাজনা আদায় করিয়া রাজ-সরকারে প্রেরণ করিতেন, প্রয়োজন মত তাহাদের কৈফিয়ৎ তলব করিতেন এবং গ্রামের মামলা-মোকর্দ্দমার আপীল শুনিতেন। তাঁহার অধীনে একদল সৈন্য থাকিত এবং নিষ্কর জমি ছাড়া তাঁহারা নগদ টাকার বৃত্তিও পাইতেন। তাঁহারা একমাত্র রাজার নিকট কৈফিয়ৎভাজন ছিলেন। সময় ও সুযোগমত দেশমুখগণ 'নায়ক' বা 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করিয়া, কেন্দ্রীয় সরকারের খাজ্‌না বন্ধ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেন।

পঞ্চম অধ্যায়

মুসলমান আমলে যাদব রাজবংশ

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে চালুক্যদের যেমন পতন হইল, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে যাদববংশীয় রাজাদের উত্থান দেখা গেল। বহুকাল ধরিয়া ইঁহারা রাষ্ট্রকূট ও কল্যাণের চালুক্য বংশীয় রাজাদের সামন্ত ছিলেন। পরে চালুক্যদের দুর্ব্বলতার সুযোগে স্বাধীনতা গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান নিজাম রাজ্যের উত্তরপশ্চিম কোণে দৌলতাবাদের সন্নিকটে ছিল দেবগিরি নামক স্থান, সেই-খানে যাদব বংশীয়েরা রাজধানী স্থাপন করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহারাষ্ট্রীয় রাজাদের অনেকেই আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ যদুর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। রাষ্ট্রকূটগণও আপনাদিগকে যদুবংশ-জাত বলিতেন; যাদবগণ তো আপনাদের উপাধির মধ্যেই বংশ-পরিচয় গাঁথিয়া রাখিয়াছিলেন।

যাদবরাজ ভিল্লম চালুক্যদের সাম্রাজ্য একটু একটু করিয়া গ্রাস করিয়া দক্ষিণাপথে রীতিমত প্রবল হইয়া উঠিলেন। ওদিকে বর্ত্তমান মহীশূরের নিকটে দ্বারসমুদ্রে রাজধানী স্থাপন করিয়া, হয়শালা-বল্লাল নামধারী বীরগণ ক্রমশঃ কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর তীর পর্য্যন্ত আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়া ফেলিলেন। ইঁহারাও যাদব বংশের একটি শাখা। প্রথমে ইঁহারা চালুক্য ও

রাষ্ট্রকূটদের করদ ছিলেন ; পরে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইঁহাদের ভিতর নবচেতনার সঞ্চার হয়—দাক্ষিণাত্যে এক নূতন স্বাধীন রাজ্য-গঠনে ইঁহারা কায়মনোবাক্যে উদ্যোগী হন।

ইহাতে দেব-গিরির যাদবরাজের স্বার্থে আঘাত লাগিল। রাজা ভিল্লম প্রকাণ্ড এক সৈন্যবাহিনী লইয়া হয়শালা-রাজ দ্বিতীয় বীর বল্লালকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু ভগবান হয়শালাদের সহায়; প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াও যাদবরাজ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলেন না—তিনি রণক্ষেত্রে অস্ত্র হাতে লইয়া চিরনিদ্রায় শয়ন করিলেন। হয়শালা-রাজ আপনাকে স্বাধীন সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। হয়শালাদের দ্বিতীয় সম্রাট্ বিষ্ণুবর্দ্ধনের রাজত্বকালে তাঁহার রাজ্য-সীমার মধ্যে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণব মহাত্মা রামানুজ আবির্ভূত হন। বিষ্ণুবর্দ্ধন তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, রামানুজের ধর্ম্মমত প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

যাদবগণ কিছুকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর ভিল্লমের পৌত্র সিংহন হয়শালাদের উপর প্রতিশোধ লইতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন। এই যদুবংশীয় বীর যুবকের অপূর্ব্ব রণকৌশলের নিকট হয়শালাগণ 'পালা পালা' রব ছাড়িতে লাগিল। সিংহন যুদ্ধ ও জয় করিতে করিতে, হয়শালাদের সমস্ত অধিকার ভেদ করিয়া, একেবারে চোল রাজাদের রাজ্য-সীমা কাবেরী নদীর তীর পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলেন। দাক্ষিণাত্য বিজয় সমাপ্ত করিয়া, সিংহন আধুনিক বেরারের অধিকাংশ ও মধ্যপ্রদেশের খানিকটা জয়

করিয়া লইলেন। তখন মুসলমানগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া দিল্লীতে রাজতক্ত স্থাপন করিয়াছেন। তুর্কীস্থানের দাসবংশ তখন উত্তর ভারতের অধিকাংশ দেশগুলি একে একে হস্তগত করিয়া, একটা বেশ ছোটখাটো সাম্রাজ্য রচনা করিয়া ফেলিয়াছেন। আলতামাস্ ও সুলতানা রিজিয়ার সমসময়ে সিংহন্ দাক্ষিণাত্যের সিংহাসনে একচ্ছত্র সম্রাট্। সিংহন্ মুসলমানদিগের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতেও ছাড়েন নাই।

কিন্তু ভারতে হিন্দু-সাম্রাজ্যগঠনের ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে গেলে, বারবার এই সত্যটাই চক্ষে পড়ে যে স্বদেশীর হাতে সাম্রাজ্য-গঠন কখনও স্থায়ী হয় না, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরও হয় না। জাতিভেদ, সম্প্রদায়-ভেদ, ভাষাভেদ ও সামাজিক আচার ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য ইহাদিগকে যেমন এতকাল এক অখণ্ড মহাজাতি-(nation) রূপে পরিণত হইতে বাধা দিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি এক দেশীয় রাজার পতাকা তলে স্বাধীনতার নামে সমবেত হইতে প্রতিবন্ধকতা জন্মাইয়াছে। কোন এক রাজা হয়ত আপন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও বিরাট প্রতিভার বলে, জীবনব্যাপী সাধনার, একটা সাম্রাজ্য গঠন করিয়া গেলেন; কিন্তু তাঁহার সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন পুত্র অথবা অপদার্থ পৌত্র সাম্রাজ্য পরিচালনার কঠোর কর্ত্তব্যে অপারগ হওয়ায়, কিংবা ভারতের চিরন্তন সহজ নীতি—গৃহ-বিবাদের মুগুর আঘাতে, তাহা অচিরে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। এমনি করিয়া ভারতে নিমেষে সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে,

আবার নিমেষে ভাঙ্গিয়াও পড়িয়াছে। এমনি করিয়া সম্রাটের বংশধরেরা শুধু সাম্রাজ্য-হারা হন নাই, আপন রাজ্যহারাও হইয়াছেন—পরিশেষে দেশের স্বাধীনতাও বিদেশীর পায়ে ডালি দিয়াছেন।

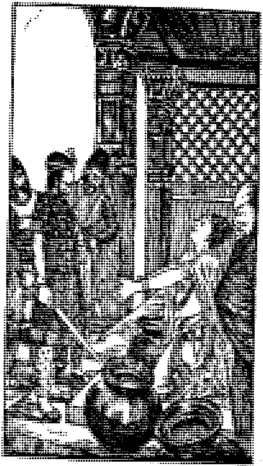
দেবগিরির যাদবদিগকেও সেই সনাতননীতির রথচক্রতলে পড়িতে হইল। সিংহনের পর তাঁহার উত্তরাধিকারীদের অক্ষমতার ফলে সাম্রাজ্যের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক এক করিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল। চোল ও হয়শালারা পুনরায় বলসঞ্চয় করিয়া, নিজেদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া লইল। চোলদের প্রতাপে একদিকে মহানদী ও গঙ্গার জল, অন্যদিকে বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গমালা থরহরি কাঁপিতে লাগিল।

ইহার কয়েক বৎসর পরের কথা। তখন জালালুদ্দিন খলজী দিল্লীর ময়ূরাসনে, রামচন্দ্র রাও যাদব দেবগিরির সিংহাসনে। জালালের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দিন্ খলজীর উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা ছিল না। আলাউদ্দিন তখন মধ্যভারতের শাসন-কর্তার পদে অধিষ্ঠিত। তিনি একদিন আট হাজার বাছা বাছা সৈন্য ও প্রচুর রশদ্ লইয়া নর্মদা নদী পার হইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। গোয়ালগড় ও চন্দোর পর্বতমালা এবং তাপ্তি, পেনগঙ্গা ও পূর্ণা নদী অতিক্রম করিয়া, তিনি হঠাৎ আসিয়া দেবগিরি চড়াও করিলেন। রামচন্দ্র রাও একে শান্তিপ্রিয় ও বিদ্যোৎসাহী লোক ছিলেন, তাহার উপর বিনামেঘে বজ্রপাতের ন্যায় বিদেশী সৈন্যের এই আচম্বিত আক্রমণে হতভম্ব হইয়া পড়িলেন। সামান্য

একটু যুদ্ধের চেষ্টা করিয়াই তিনি আলাউদ্দিনের সঙ্গে সন্ধি করিতে চাহিলেন।

রামচন্দ্র কোষাগারের সমস্ত ধনরত্ন আলাউদ্দিনের পায়ে ঢালিয়া দিলেন। প্রাসাদের শ্রেষ্ঠ বস্ত্রালঙ্কার সমুদায়ও এই বিজয়ী মুসলমানের ক্ষুধিত চক্ষুর নীচে রাশাকৃত করিয়া দেওয়া হইল। বড় বড় গাড়ীতে করিয়া এই সকল নজরানা লইয়া আলাউদ্দিন শহর পরিত্যাগ করিতেছেন, এমন সময় একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটিয়া বসিল। রামচন্দ্রের বড় ছেলেটি আলাউদ্দিনের সহিত পিতার শান্তিজনক কথাবার্তার অবসরে চুপিসাড়ে নগরের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। একে মহারাষ্ট্র রাজার ছেলে, তায় ধমনীতে যদুবংশের উগ্ররক্ত প্রবাহিত; সে এ অপমান মাথা নীচু করিয়া সহিয়া যাইতে চাহিল না। রাজপুত্র বাহির হইতে তাড়াতাড়ি একদল সৈন্য যোগাড় করিয়া, আলাউদ্দিনকে যুদ্ধে নিমন্ত্রণ করিল।

নগরের প্রান্তে এক ভীষণ যুদ্ধ হইল। মারাঠী যুবরাজের পরাক্রমে আলাউদ্দিনের বহু সৈন্য হতাহত হইল। কিন্তু বৃদ্ধ পিতা বেচারা ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু,—সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া নগর-দুর্গ হইতে পুত্রকে সৈন্য-সাহায্য করিতে তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। শেষে যুবরাজের পতন হইল। আলাউদ্দিন ক্রোধে আত্মহারা হইয়া, বৃদ্ধ রাজার নিকট তাঁহার উদ্ধত পুত্রের এই বিশ্বাসঘাতকতার কৈফিয়ৎ চাহিলেন। দেবগিরিরাজ অতি কষ্টে আরো কিছু সোনাদানা সংগ্রহ করিয়া ও বেরারে এলিচপুর



'রামচন্দ্র কোষাগারের সমস্ত ধনরত্ন
আলাউদ্দিনের পায়ে ঢালিয়া দিলেন।'

[মহারাষ্ট্র—৩২ পৃষ্ঠা]

সন্নিহিত সমস্ত স্থানের স্বত্ব ত্যাগ করিয়া, তাঁহার ক্রোধ শান্ত করিলেন।

ইহার পর আলাউদ্দিন দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া, দেবগিরির রাজার নিকট হইতে নিয়মিত কর আদায় করিতে লাগিলেন। ১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামচন্দ্র গুজরাটের বাঘেলা বংশীয় পলাতক রাজাকে আশ্রয় দেওয়ায় ও করদানে অস্বীকার করায়, মালিক কাফুরের অধীনে একদল সৈন্য আসিয়া, বহু জয়-পরাজয়ের পরিণামে দৌলতাবাদ অধিকার করিল। শেষে মরণাপন্ন রামচন্দ্র যুদ্ধের খেসারৎ দিয়া ও উচ্চতর হারে করদানে প্রতিশ্রুত হইয়া, মালিক কাফুর ও তাঁহার বাদশাহ্ প্রভুকে সন্তুষ্ট করিলেন।

কিন্তু দুই বৎসর পরে তাঁহার পুত্র শঙ্কর রাও যাদব দেবগিরির ভগ্নপদ সিংহাসনে বসিয়াই দিল্লী-সরকারে মালগুজারি পাঠানো বন্ধ করিয়া দিলেন। আবার মালিক কাফুর সসৈন্যে দেবগিরিতে আসিলেন এবং শঙ্করকে পরাজিত ও নিহত করিয়া দেবগিরি রাজ্য দিল্লী-সাম্রাজ্যের এলাকাভুক্ত করিলেন। অতঃপর মালিক কাফুর তাঁহার দলবলসহ এখানে বসতি স্থাপন করিয়া, যাদবরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ৩১৬ সালের শেষভাগে আলাউদ্দিনের মৃত্যু হইলে, মালিক কাফুর তাড়াতাড়ি দিল্লী চলিয়া গেলেন।

ইতোমধ্যে রামচন্দ্রের জামাতা ও শঙ্করের ভগিনীপতি হরপাল দেও কতকগুলি মারাঠা দেশমুখকে দলে টানিয়া আনিয়া, বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। দেবগিরি দুর্গের চারিপার্শ্বের বিস্তৃত ভূমিখণ্ড

হরপালের অধীনে আসিল। কিন্তু আলাউদ্দিনের দুশ্চরিত্র পুত্র সুলতান্ মুবারিক আসিয়া, বহু সৈন্য-সহায়তায় হরপাল দেওকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন। নিষ্ঠুর সম্রাটের আদেশে জীবন্ত অবস্থায় হরপালের দেহ হইতে গাত্রচর্ম্ম টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলা হইল। হিন্দুর স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠার উদ্যম আবার কিছু দিনের জন্য অন্ধকারে মুখ লুকাইয়া রহিল।

যাদবরাজাদের আমলে দাক্ষিণাত্যে ও মধ্যভারতে শিল্প ও সাহিত্যে এক নব জাগরণের সূচনা হয়। যাদবগণ প্রজারঞ্জক, সুশিক্ষিত ও ধার্ম্মিক ছিলেন। দেবগিরির রাজাদের সহায়তায় পণ্ডিত হেমাদ্রি বহুতর স্মৃতিগ্রন্থ সঙ্কলন করেন এবং বোপদেব তাঁহার প্রসিদ্ধ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ রচনা করেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই যাদবদেরই সামন্ত নিকুম্ভবংশীয় রাজাদের উৎসাহে ভাস্করাচার্য্য তাঁহার ভুবনবিশ্রুত জ্যোতিষ-বিজ্ঞান ও গণিত শাস্ত্রসমূহ রচনা করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাহ্‌মানী সাম্রাজ্য

১৩২৫ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ পিতা গিয়াসুদ্দিন তোগ্‌লক্‌কে হত্যা করিয়া, তাঁহার পুত্র মোহাম্মদ তোগ্‌লক দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তিনি সুপণ্ডিত ও গোঁড়া মুসলমান ছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার মত হৃদয়হীন ও খামখেয়ালী বাদ্‌শাহ ভারতের ইতিহাসে আর দ্বিতীয় দেখা যায় নাই। হঠাৎ তাঁহার মাথায় এক অদ্ভুত খেয়াল চাপিল। তিনি দিল্লী হইতে দেবগিরিতে রাজধানী পরিবর্ত্তন করিলেন। দেবগিরির নাম তখন পরিবর্ত্তিত হইয়া হইল 'দৌলতাবাদ'। কিন্তু নানা অসুবিধায় পড়িয়া তাঁহার আবার মতের পরিবর্তন হয়। আবার সকলকে নিজেদের ধন-সম্পত্তি গরু-বাছুর লইয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আসিতে হইল। তখনকার দিনে এই সাত শত মাইল আসা-যাওয়া করিতে প্রজাবৃন্দ ও রাজকর্ম্মচারীদের যে কি নিদারুণ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। সে যাহা হউক, মালিক কাফুরের সময় হইতেই তুর্ক ও আফগান দেশীয় মুসলমান্‌গণ ক্রমশঃ উত্তরপূর্ব্ব মহারাষ্ট্রে ও দৌলতাবাদ অঞ্চলে আসিয়া বসতি স্থাপন করিতেছিল। তারপর মুসলমান শাসন যখন যাদবদের রাজ্যে পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন বহু

ভাগ্যান্বেষী ও ব্যবসাদার মুসলমান এইখানে ডেরাডাণ্ডা বিছাইতে লাগিলেন।

মোহম্মদ তোগলকের যথেচ্ছাচার ও কুশাসনে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। গুজরাট ইতঃপূর্ব্বেই মুসলমানদের করতলগত হইয়াছিল। সম্রাটের অত্যাচারে অতিষ্ট হইয়া, সেখানকার কয়েকজন মুসলমান্ ওমরাহ ও সামন্ত তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন; ইহাতে সম্রাট্ তাহাদিগকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু ওমরাহ ও সামন্তগণ দৌলতাবাদে পলাইয়া আসিয়া, সেখানকার শাসনকর্ত্তা কতলুগ্ খাঁর আশ্রয় লইলেন। তাঁহাদিগকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য কত্লুগ্ খাঁর চাকুরী গেল। এই সময় গুজরাট হইতে যে সকল কর্ম্মচারী ও সিপাহী সম্রাটের ফার্ম্মান্ লইয়া অপরাধীদিগকে ধরিতে আসিয়াছিল, তাহাদের সর্দ্দার নিহত হইলেন।

১৩৪৪ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি হিন্দু সামন্তের সহায়তা লাভ করিয়া, এই সকল মুসলমান ওমরাহ বিদ্রোহের ধ্বজা উড়াইয়া দিলেন। দৌলতাবাদের দুর্গ বিদ্রোহীদের নিকট তাহার দ্বার খুলিয়া দিল। মোহাম্মদ তোগলক্ ইহাদিগকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য প্রকাণ্ড সৈন্যবাহিনী লইয়া দৌলতাবাদে আসিয়া পৌছিলেন। সম্রাট্ দুর্গ অবরোধ করিলেন। কিন্তু বাহির হইতে জাফর খাঁ নামক একজন বিদ্রোহীদলের সেনাপতি সম্রাটের দলকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। জয়লাভের উপক্রম

হইতেছে, এমন সময় সম্রাট্ খবর পাইলেন যে, দিল্লীতেও একটা বিদ্রোহের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তখন তিনি আহ্‌মদ-উল্-মুল্ক নামক সেনাধ্যক্ষের অধীনে একদল সৈন্য রাখিয়া, তাড়াতাড়ি রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে বিদ্রোহী জাফর খাঁর দলে ওয়ারাঙ্গলের তৈলিঙ্গী রাজার ১৫,০০০ অশ্বারোহী, এবং দৌলতাবাদ দুর্গ হইতে পাঁচ হাজার পদাতিক সৈন্য আসিয়া যোগ দিয়াছে; তাঁহার হাতে পূর্ব্ব হইতেই আরও ২০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য মৌজুদ ছিল। সমস্ত বিদ্রোহী দল একত্র হইয়া, জাফর খাঁর অধীনে আহ্‌মদ্ উল্-মুল্কের বাদশাহী সৈন্যদলকে ভীম বিক্রমে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। বিদরের নিকট উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধ হইল। আহ্‌মদ্-উল্-মুল্ক্ পরাজিত ও নিহত হইলেন। সকল হিন্দু ও মুসলমান্ সামন্ত মিলিয়া জাফর খাঁকে দৌলতাবাদের সিংহাসনে স্বাধীন সম্রাট্‌রূপে অভিষিক্ত করিলেন।

জাফর খাঁ পূর্ব্বে দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের ক্রীতদাস ছিলেন। পরে তাঁহার প্রভুকে সেবায় তুষ্ট করিয়া তিনি মুক্তি লাভ করেন। বিদায়-কালে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কিছু অর্থ পুরস্কার দেন্ এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, তিনি নিশ্চয়ই রাজা হইবেন। ব্রাহ্মণের সে ভবিষ্যদ্বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল। জাফর খাঁ, আলাউদ্দিন্ হাসান্ অল্ বাহ্‌মানী নাম ধারণ করিয়া, বর্ত্তমান নিজাম রাজ্যের অধিকাংশ ভূভাগ ও পশ্চিম মহারাষ্ট্রদেশের কতকাংশ ব্যাপিয়া বিস্তৃত সাম্রাজ্যের

অধীশ্বর হইয়া উঠিলেন। এইভাবে দাক্ষিণাত্যে বাহ্‌মানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল। তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল আধুনিক কুলবর্গা বা গুল্‌বর্গার গায়ে; উহার নূতন নামকরণ হইল হাসানাবাদ (১৩৪৭ খৃঃ)।

ভাগ্যচক্রের এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনে, জাফর খাঁ ওরফে সম্রাট্‌ হাসান্ বাহ্‌মানী তাঁহার পূর্ব্বাবস্থার কথা ভুলিয়া যান নাই। কৃতজ্ঞতার মর্য্যাদা রাখিতে, তিনি তাঁহার পূর্ব্বতন মনিবকে দিল্লী হইতে সসম্মানে ডাকিয়া পাঠাইয়া, তাঁহাকে দেওয়ানের পদ প্রদান করিলেন। উত্তর কালে দেওয়ানের পরামর্শ ব্যতীত তিনি কোন গুরুতর রাজকার্য্য করিতেন না। ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে হাসান্ বাহমানীর যখন মৃত্যু হইল, তখন তাঁহার রাজ্য-সীমা উত্তরে প্রাণহিত ও পেনগঙ্গা নদীর তীর পর্য্যন্ত, দক্ষিণে কৃষ্ণা নদীর তীর পর্য্যন্ত, পূর্ব্বে ওয়ারাঙ্গল রাজ্যের সীমা (বর্ত্তমান নিজামরাজ্যের এক তৃতীয়াংশ পূর্ব্বভাগ) পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে চন্দোর ও মহানদীর মধ্যস্থ ভূভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হাসান্ বাহ্‌মানীর পর আরো তেরো পুরুষ ১৫১৮ খৃষ্টাব্দ অবধি বিপুল বাহ্‌মানী সাম্রাজ্য শাসন করেন। ইতোমধ্যে পেনগঙ্গার উত্তরে বেরার দেশের অধিকাংশও বাহ্‌মানী রাজ্যের সামিল হইয়াছিল।

বাহ্‌মনী বংশের পাঠান রাজগণের দেড় শত বৎসরের শাসনকাল-মধ্যে অধিকাংশ মহারাষ্ট্রভূমিই তাঁহাদের তাঁবে ছিল। কিন্তু বহু দেশমুখ ও নায়ক নাম মাত্র অধীনতা স্বীকার করিয়া ছিলেন এবং তাঁহাদের কেহ কেহ কেন্দ্রীয় শাসন ও সৈন্য-

বিভাগে উচ্চ পদসমূহে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অধীন দেশমুখগণ অতি সামান্য মালগুজারী প্রাদেশিক মুসলমান্ শাসন-কর্ত্তাকে পাঠাইয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত হইতেন ; তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কচিৎ হস্তক্ষেপ করা হইত। কিন্তু সাতপুরা ও পশ্চিমঘাটের দুর্গম স্থানসমূহের সর্দ্দার বা দেশমুখগণ এই দেড়শত বৎসরের মধ্যে মুসলমান অধীনতার কোন ধার ধারেন নাই। আবার সুবিধা ও সুযোগ পাইলে, দেশমুখগণ খাজনা পাঠানো বন্ধ করিয়া ও বিদ্রোহাচরণ করিয়া, কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন।

দ্বিতীয় বাহ্মানী-সম্রাট্ মোহাম্মদ শাহের রাজত্ব-কালে এইরূপ একটা বিদ্রোহ একটু ঘোরাল রকমের হইয়া উঠিয়াছিল। মোহাম্মদ শাহ্ তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত প্রতাপশালী বিজয়নগর নামক হিন্দু রাজ্যের বিরুদ্ধে এক অভিযান করিয়াছিলেন। সেই সুযোগে গোবিন্দ দেও নামক যাদব বংশীয় এক সর্দ্দার— যিনি দেবগিরির পশ্চিমে সামান্য একটু যায়গায় দেশমুখ হইয়া কোন রকমে টিঁকিয়া ছিলেন, তিনি প্রবল হইয়া, দেবগিরির (দৌলতাবাদের) শাসন-কর্ত্তা, বহ্রাম খাঁকে হাত করিয়া ফেলিলেন্। তাঁহারা বাগ্‌লানার রাজার নিকট হইতে অর্থ ও সৈন্য-সাহায্য পাইয়া, অনুপাস্থত সুল্‌তানের অধীনতা অস্বীকার করিয়া, তাঁহার রাজধানী হাসানাবাদ অধিকার করিতে চলিলেন। এই খবর পাইয়া, মোহাম্মদ শাহ্‌র বিশ্বাসভাজন কর্ম্মচারীরা রাজধানী ও তাহার চতুষ্পার্শ্ব হইতে যথাসাধ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ইঁহাদিগকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন।

এমন সময় সম্রাট্ ও বিজয়নগর সংগ্রাম হইতে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া, সমস্ত ব্যাপার শুনিতে পাইলেন। প্রাচীন তগারা রাজ্যের রাজধানী পৈথান্ নগরের নিকট শিউগাঁওয়ে দুইদলের সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল। যুদ্ধ আরম্ভ হইতেছে, এমন সময় একদিন ঘোড়ায় চড়িয়া সম্রাট্ আসিয়া দুই যুধ্যমান সৈন্যের মাঝখানে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই বিদ্রোহীদলের জয়াশা নিমিষে উড়িয়া গেল। প্রথমেই বহ্‌রাম খাঁ লজ্জায় হেঁট হইয়া সম্রাট্‌কে শত কুর্ণীস্ করিলেন; তাঁহার পিছনে যে যেদিকে পারিল পলাইয়া গেল। কিন্তু বহ্‌রাম খাঁ একটু ধৈর্য্য ও সাহসে বুক বাঁধিলে, তাঁহার দাসমনোভাব এই সঙ্কট সময়ে এমন করিয়া তাঁহাকে কাপুরুষ না সাজাইলে, হয়ত হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত সৈন্য বাহ্‌মানী রাজ্যের অদৃষ্টচক্র বিপরীত দিকে ঘুরাইয়া দিত!

মাওয়ালী, কোল প্রভৃতি পার্ব্বত্য উপজাতিরা স্থায়ীভাবে কখনও মুসলমানদের শাসনাধিকারে আসে নাই। মহাদেও পর্ব্বতাঞ্চলের অধিবাসীরা প্রায়ই মুসলমান অধিকারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া লুঠ-তরাজ করিত। দক্ষিণ কঙ্কনেও মহারাষ্ট্রগণ মুসলমানী শাসন কথায় কথায় অগ্রাহ্য করিতেন। পুনা, সাতারা, কোলাপুর, কারড্, ওয়াই, জামখণ্ডি, নাগথানা, দাপোলি, রাজাপুর প্রভৃতি স্থান তখনও পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র স্বাধীন মহারাষ্ট্রীয় রাজাদের ছত্র-ছায়া-তলে নির্ভয়ে কাল-যাপন করিতেছিল। তাঁহাদের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে অভিযান প্রেরিত হইত। কিন্তু উহাতে বিশেষ কোন ফল দর্শে নাই।

অবশেষে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে মল্লিক-উল-তিজারের নায়কতায় একদল সুনির্ব্বাচিত বাদশাহী সৈন্য এইদিকে প্রেরিত হইল। বহুকষ্টে নানা ক্ষতি স্বীকার করিয়া, সহ্যাদ্রি পর্ব্বতমালার মধ্যভাগের কয়েকটি স্থান তিনি দখল করেন। পুনার চৌদ্দ মাইল উত্তরে চাকুন হইতে জুন্নার নগর পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য ভূমিতে মুসলমান পতাকা প্রোথিত হয়। জুন্নারে মল্লিক তিজার এক দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্য দুর্গ-নির্ম্মাণ করিলেন এবং চাকুনে একটা শাসন-কেন্দ্র স্থাপন করিলেন। তিনি পুনার আরো কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে ভোরের নিকটবর্ত্তী এক স্বাধীন রাজাকেও অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করেন। যাহা হউক, মহারাষ্ট্র রাজারা পরাক্রমে যদিবা কখনও মুসলমানের নিকট হটিয়া গিয়া থাকেন, কিন্তু কূটকৌশলে তাঁহাদের নিকট কখনও মাথা নীচু করেন নাই। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

ভোরের রাজা মল্লিককে বেল্লিক বানাইবার এক চমৎকার ফন্দি আঁটিলেন। তিনি জানাইলেন, সিংহগড়ে তাঁহার এক ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বী ও ঘোর অত্যাচারী রাজা আছেন, তাঁহাকে যদি মুসলমান সেনাপতি জব্দ করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলেই তিনি ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন এবং প্রতি বৎসর নিয়মিত চড়া হারে খাজ্‌না পাঠাইয়া দিবেন। সেনাপতি সরল প্রাণে এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, পুনার চারি ক্রোশ দক্ষিণে সিংহগড় দখল করিতে রওনা হইলেন। পথিমধ্যে একদিন গভীর নিশীথে আচম্বিতে ভোর-রাজের দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যদল দুর্গম

পর্বত-পার্শ্ব হইতে পৈশাচিক উল্লাসে মুসলমান সৈন্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। সাত হাজার সৈন্য কচুর মতো মহারাষ্ট্রের শাণিত খড়্গে কাটা পড়িল। মল্লিক সাহেব কোনরূপে প্রাণ লইয়া ও মানটুকু খোয়াইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর ১৫।১৬ বৎসরকাল আর কোন অভিযান এই অঞ্চলে প্রেরিত হয় নাই।

প্রথম বাহমানী সুলতান আলাউদ্দিন হাসানের সময় হইতেই গুল্বর্গা সাম্রাজ্য চারিটি প্রদেশে ('তরফ') বিভক্ত হইয়াছিল; এবং প্রত্যেক প্রদেশে এক একজন শাসন-কর্তা বা তরফদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রদেশগুলির নাম—গুল্বর্গা, দৌলতাবাদ, তৈলিঙ্গন ও বেরার। তাহার পর এক-শত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে তুঙ্গভদ্রা তীরের প্রবল প্রতাপান্বিত বিজয়নগর রাজ্যের বেশীর ভাগ, ওয়ারঙ্গল রাজ্য, তৈলিঙ্গন রাজ্যের উত্তরাংশ ও ওড়িষ্যার দক্ষিণ পূর্ব্বাংশ এবং দক্ষিণ পশ্চিমে কোলাপুর হইতে গোয়া পর্য্যন্ত ভূভাগ তাঁহাদের অধিকারে আসিয়া পড়িল। আজকালকার খান্দেশ, নাসিক, থানা, কোলাবা প্রভৃতি কয়েকটি জেলা ও দুরারোহ পর্ব্বতাঞ্চল ছাড়া সমস্ত মহারাষ্ট্রই তখন মুসলমানদের প্রজা!

ত্রয়োদশ সুলতান্ মোহম্মদ শাহ্ বাহ্মানীর উজীর খাজা জাহান্ মাহমুদ গাওয়ান্ এই বিস্তীর্ণ রাজ্যকে আর চারিটি প্রদেশে বিভক্ত রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না; কারণ তাহা হইলে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের ক্ষমতা অত্যন্ত বাড়িয়া যায় এবং তাহার

ফলে সুযোগমত ভবিষ্যতে ইঁহারা স্বাধীনতা ঘোষণায়ও ইতস্ততঃ করিবেন না। সুতরাং তিনি নবার্জ্জিত অধিকার সমেত পুরাতন চারিটি প্রদেশকে নিম্নলিখিত আট্‌টি তরফে ভাগ করিলেন।

পুরাতন গুলবর্গা প্রদেশ ভাঙ্গিয়া গঠিত হইল—

(১) বিজাপুর—ভীমা ও কৃষ্ণার ত্রিমোহানার পশ্চিম ভাগস্থ সমস্ত দেশ; ইহার সহিত বিজয়নগর-হইতে-বিজিত রাইচুর ও মুদগল শহরও যুক্ত রহিল। উজীর মাহ্‌মুদ গাওয়ান নিজে এই প্রদেশের শাসন-কর্ত্তা হইলেন।

(২) হাসানাবাদ—ভীমা নদীর উত্তর পারে শোলাপুর, আকালকোট, গুলবর্গা, শাহাবাদ, ওয়াজি প্রভৃতি স্থান ইহার মধ্যে রহিল। হাবশীদেশীয় দস্তুর দীনার ইহার শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন।

পুরাতন দৌলতাবাদ তরফ্‌ ভাঙ্গিয়া গঠিত হইল—

(৩) দৌলতাবাদ—ইউসুফ্‌ আদিল শাহ্‌ ইহার প্রথম শাসন কর্ত্তা।

(৪) জুন্নার—উত্তরে জুন্নার শহর হইতে দক্ষিণে বেল্‌গাম্‌ পর্য্যন্ত ও গোয়া। ইহার প্রথম শাসনকর্ত্তা হইলেন ফকীর-উল্‌-মুল্ক।

তৈলিঙ্গন তরফ ভাঙ্গিয়া তৈয়ারী হইল—

(৫) রাজমহেন্দ্রী—মসলিপত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া, উত্তরপূর্ব্বে প্রায় গঞ্জাম এবং পশ্চিম দিকে প্রায় হায়দ্রাবাদ পর্য্যন্ত প্রলম্বিত ভূভাগ। নিজাম-উল্‌-মুল্ক বিহারী ইহার প্রথম গভর্ণার।

(৬) ওয়ারঙ্গল্—ইহার প্রথম শাসন-কর্ত্তা হইলেন আজিম খাঁ।

বেরার প্রদেশ দুইখণ্ডে বিভক্ত হইয়া সৃষ্ট হইল—

(৭) গয়াল্—উত্তর ভাগ। ফতেউল্লা ইমাদ্ উল্-মুল্ক্ প্রথম শাসক।

(৮) মাহুর—দক্ষিণ ভাগ। ইহার শাসন-কর্ত্তা হইয়া আসিলেন হাব্‌শী দেশীয় খোদাবন্দ খাঁ।

রাজমহেন্দ্রী • প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিজাম-উল্-মুল্ক্ সুলতানের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি এক ব্রাহ্মণ কুল্‌ক্রানীর ছেলে; কৈশোরে মুসলমান সিপাহী কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া বাহমানী রাজ্যে নীত হইয়াছিলেন। সুলতানের নজরে পড়িয়া তাঁহার ভাগ্য ফিরিয়া যায়। মুসলমান্ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, তিনি 'হাজারী' বা এক হাজার সৈন্যের অধ্যক্ষ হইলেন। তারপর মাহ্‌মুদ গাওয়ানের বহু খোসামুদী করিয়া, ক্রমে পাঁচ ও দশ হাজার সৈন্যের সেনাপতিপদে উন্নীত হন্। তারপর উজীরেরই সুপারিশে তিনি তৈলিঙ্গনের তরফদার হইয়াছিলেন।

কিন্তু মাহমুদ গাওয়ান্ তৈলিঙ্গন প্রদেশ ভাঙ্গিয়া দুইভাগ করিয়া দেওয়ায়, তাহার প্রতাপ কিছু খর্ব্ব হইয়া পড়িল। ইহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, সুলতানের নিকট আসিয়া মিথ্যা করিয়া, তাঁহার হিতৈষী বন্ধু গাওয়ানের নামে রাজদ্রোহের নালিশ রুজু করিলেন। এক প্রকার বিনা বিচারেই এই উদারহৃদয় ও বহুদর্শী উজীরের প্রাণদণ্ড হইল। তখন ধূর্ত্ত নিজাম-উল্-মুল্ক্ প্রধান মন্ত্রীর আসন

অধিকার করিয়া, সুলতানের চোখের উপর বড় বড় জায়গীর নিজের তরফে টানিয়া আনিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর পরে নিজামও ঠিক এইভাবে এক কৃতঘ্ন কর্মচারীর হস্তে নিহত হইলেন। যাহা হউক, নিজাম উজীরী লইলে, রাজমহেন্দ্রীর শাসন-কর্তার পদে তাঁহার পুত্র মালেক আহমেদ বিহারী উপবেশন করিয়াছিলেন।

সুলতান মোহাম্মদ শাহের স্বভাব-চরিত্র ভাল ছিল না; তিনি অত্যন্ত মদ্যপায়ী, দুর্ব্বলচিত্ত ও বিবেচনাহীন ছিলেন। তাঁহার রাজদরবারে ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যা অপবাদ, প্ররোচনা ও বিবাদ-বিসম্বাদের অন্ত ছিল না। গাওয়ানের মৃত্যুকালীন্ নীরব অভিশাপ এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের উপর একদিন কালবৈশাখীর রুদ্র ঝঞ্ঝা ডাকিয়া আনিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা একে একে খাজনা পাঠানো বন্ধ ও প্রকারান্তরে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। মোহম্মদ শাহের মৃত্যুর সময় তাঁহার রাজ্যসীমা কেবলমাত্র হাসানাবাদের মধ্যে পর্য্যবসিত হইল। তাঁহার পর চারিজন সুলতান্ অল্পদিন করিয়া রাজতক্তে বসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে খেলার পুতুল করিয়া সুচতুর মন্ত্রী কাসেম বারিদ রাজ্য-পরিচালন করিতে থাকিলেন। অবশেষে তিনিও সুযোগ পাইয়া, মন্ত্রীর মুখোস্ খুলিয়া ফেলিয়া, নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

এমনই করিয়া দাক্ষিণাত্যের বিরাট বাহ্‌মানী সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। কয়েক বৎসর ধরিয়া এই খণ্ড

রাজ্যগুলির মধ্যেও প্রাধান্য ও রাজসীমা-বৃদ্ধি লইয়া কামড়া-কামড়ি চলিল। তারপর যে ঘটনার সূত্রপাত হইল, তাহা পৃথিবীর স্বাধীনতার ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

আহ্মেদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা

বাহ্মানী রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী উজীর মাহমুদ গাওয়ান্ বিজাপুর তরফের রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন, তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়েই বলা হইয়াছে। রাজাদেশে তাঁহার যখন প্রাণদণ্ড হইল, তখন ইউসুফ্ আদিল শাহ্‌কে দৌলতাবাদ তরফ হইতে বিজাপুরের তরফদার করিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হইল। বিজাপুরে আসিয়া তাঁহার ক্ষমতা-বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা ঘটিতে লাগিল। অবশেষে ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বাধীনতার পতাকা উড়াইয়া, বিজাপুর রাজ্যে আদিল্ শাহী রাজবংশের পত্তন করিলেন।

এদিকে দৌলতাবাদের তরফদারের পদ খালি পড়িয়াছিল। তখন কিছুদিন পর্য্যন্ত নিজাম-উল্-মুল্ক্ প্রায়শঃ রাজধানীতে

বসিয়াই উহার শাসন-পরিচালন করিয়াছিলেন এবং হিঙ্গোরী, পাথরী, ভীর প্রভৃতি জিলা দৌলতাবাদের সহিত সংযোগ করিয়া তিনি উহাকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। তারপর তিনি জুন্নার তরফও দৌলতাবাদের সহিত পুনরায় একীভূত করিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা বড় একটা প্রদেশ গড়িয়া তুলিলেন। নিজামের পুত্র মালেক আহ্মেদ এতদিন রাজমহেন্দ্রীর তরফদারি করিতেছিলেন। উজীরের কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া ও অপদার্থ সুলতানকে চোখের আড়াল করিতে ইচ্ছুক না হইয়া, সুচতুর নিজাম, পুত্র মালেক্ আহ্মেদকে রাজমহেন্দ্রী হইতে ডাকিয়া পাঠাইয়া, দৌলতাবাদের তরফদার করিয়া পাঠাইয়া দিলেন (১৪৮৫ খৃঃ)।

নিজাম-উল্ মুল্ক্ নিহত হওয়ার কিছুদিন পরেই মালেক্ আহ্মেদ বাঁকিয়া বসিলেন। পিতার সহায়তায় তিনি তখন প্রকৃত ধনরত্ন ও লোভনীয় রাজ্যখণ্ডের সর্ব্বময় কর্ত্তা। তিনি ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে আহ্মেদ্ নিজাম-উল্ মুল্ক্ বিহারী শাহ্—এইরূপ দিগ্ গজ নামে ভূষিত হইয়া, ভগ্নপ্রায় বাহ্মানী সাম্রাজ্য হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িলেন। পরে তিনি দৌলতাবাদ হইতে রাজধানী উঠাইয়া, প্রায় বত্রিশ ক্রোশ দক্ষিণে আহ্মেদনগর নামক নূতন রাজধানীর পত্তন করিলেন। এইভাবে স্বাধীন আহ্মেদনগর রাজ্য নিজামশাহী বংশের দ্বারা গঠিত হইয়া উঠিল। এই নবীন রাজ্যকে জয় করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বাহমানী সুলতান কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

নিজাম-উল্-মুল্কের মৃত্যুর পর, গঙ্গাম ও চিকাকোল অঞ্চল

রাজমহেন্দ্রী-তরফ হইতে উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা কাড়িয়া লইলেন ; সুতরাং এই তরফের আয়তন ক্ষুদ্রতর হইয়া যাওয়ায় উহার সহিত ওয়ারঙ্গল্ তরফ মিলাইয়া পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় তেলিঙ্গন তরফ গঠিত হইল। কুতব-উল্-মুল্ক্ ইহার তরফদার হইলেন। ওয়ারঙ্গল্ ও রাজমহেন্দ্রীতে তরফদারের দুইজন ফৌজদার মোতায়েন রহিলেন, নূতন রাজধানী হইল বর্ত্তমান হায়দ্রাবাদ শহরের নিকটে গোলকুণ্ডায়। ১৫১২ খৃষ্টাব্দে কুতব-উল্-মুল্ক্ স্বাধীন হইয়া গোলকুণ্ডায় কুতব শাহী রাজবংশের ভিত্তিস্থাপন করিলেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বেরারের ভাঙ্গা তরফ দুইটি পুনরায় জোড়া লাগিয়াছিল এবং ফতেউল্লা ইমাদ্-উল্-মুল্ক্-এর বংশধরগণ ফাঁক পাইয়া, অন্য সকলের মত, এখানেও স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইমাদ্ শাহীদের স্বাধীনতা বেশীদিন বজায় থাকে নাই। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে আহ্মেদনগরের চতুর্থ নবাব মূর্ত্তাজা নিজাম শাহ্ বহু লড়াই করিয়া, বেরার তরফ্টি নিজ রাজ্যের সামিল করিয়া লন্।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উজীর আমীর বারিদ নিজেকে হাসানাবাদের সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিয়া গুল্‌বর্গার বাহ্মানী সিংহাসনে কায়েম হইয়াছিলেন। তিনি হাসানবাদ হইতে কয়েক ক্রোশ উত্তরে বিদর নামক স্থানে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। বিদররাজ্য আয়তনে যেমন সকলের চেয়ে ছোট ছিল, ক্ষমতায়ও তেমনি সকলের হীন ছিল। কাজেই বারিদশাহী

রাজ্যও কয়েক বৎসর পরে বেরারের পরিণাম-ভাগী হইল। ইহার অধিকাংশ বিজাপুর ও বাকী অংশ গোলকুণ্ডা-রাজ্য গ্রাস করিয়া, নিজেদের দেহ পুষ্ট করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অধিকাংশ মহারাষ্ট্রদেশ তুর্কী ও আফগান্ বাদ্‌শাহ্-কর্তৃক অধিকৃত হইলেও মহারাষ্ট্র দেশমুখগণ মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করিতেন; কেহ কেহ বা দুর্গম গিরিদুর্গে নিরাপদ হইয়া, পরস্পর-বিশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানসমূহ স্বাধীনভাবে শাসন করিতেন। মালেক আহ্‌মেদ বেহারীর তরফদারির যুগে পুনা অঞ্চলের কতকগুলি সর্দ্দার একযোগে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিলেন। মালেক বহু সৈন্য ক্ষয় করিয়া, নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া, পুনার চারিপার্শ্বস্থ লোহগড়, সিংহগড় প্রভৃতি দুর্গ-সমেত ভূমি অধিকার করেন। পুণার দক্ষিণপূর্ব্বদিকে খোন্দা-রাজপুরের সর্দ্দারকেও তিনি অবনমিত করিয়াছিলেন।

১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ভাস্কো ডাগামার নেতৃত্বে একদল পর্ত্তুগীজ আসিয়া কেরল দেশের (বর্ত্তমান মাঙ্গালোরের দক্ষিণে) কালিকট নামক স্থানে আসিয়া অবতরণ করেন। কিছুদিন তাঁহারা ভদ্রভাবে দেশবাসীর সহিত মেলামেশা করার পর, দেশীয় নৌকায় করিয়া নানা নদনদীতে ব্যবসায় অছিলায় বেড়াইতে লাগিলেন। শেষে আরো কয়েক দল পর্ত্তুগীজ দেশ হইতে আসিয়া পড়িল; তাহারা কেরল ও দক্ষিণ কঙ্কনের স্থানে স্থানে আড্ডা গাড়িল। ক্রমে ক্রমে পর্ত্তুগাল হইতে বহু পর্ত্তুগীজ ভাগ্যান্বেষী আসিয়া জুটিল; তাহাদের

সঙ্গে গোপনে কামান-বন্দুকও প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইল। শেষে তাহারা আহ্‌মেদনগর ও বিজাপুর রাজ্যের পশ্চিম উপকূলে দারুণ দস্যুতাও সুরু করিল।

গোয়া তখন বিজাপুর সুলতানের অধীন। পর্ত্তুগীজদের নায়ক আলফোঞ্জো ডি আলবুকার্কের সতৃষ্ণ দৃষ্টি ইহার উপর পতিত হইল। ইতঃপূর্ব্বে তিনি দাবুল শহর লুণ্ঠন করিয়া, ভস্মসাৎ করিয়া দিয়াছিলেন। তিম্মোজী নামক কেরল দেশীয় এক দুর্দ্দান্ত জলদস্যু পর্ত্তুগীজদের দলে আসিয়া যোগ দিলেন। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে গোয়ার উপর পর্ত্তুগীজ কামানের গোলা আসিয়া মৃত্যুর বিভীষিকা সৃষ্টি করিল। ভারতবর্ষে এই প্রথম কামান গর্জ্জন শ্রুত হইল। গোয়ার শাসন-কর্ত্তা সদলবলে পলায়নপর হইলেন। গোয়ার চারিপার্শ্বে বহুস্থান পর্ত্তুগীজরা ক্রমে দখল করিয়া লইয়া, একটি ছোটখাট সুরক্ষিত রাজ্য গড়িয়া তুলিলেন। পরে সমগ্র ষোড়শ শতাব্দী ব্যাপিয়া এই গোয়াকেই কেন্দ্র করিয়া, তাঁহারা সারা পশ্চিমভারতীয় উপকূলে সুবিধামত জলদস্যু-বৃত্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইয়াছিলেন।

১৫২৯ খৃষ্টাব্দে আহ্‌মেদনগরের দ্বিতীয় সুল্‌তান্ বুর্হাণ নিজাম শাহ্ এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। এই ঘটনাটি মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসের একটা স্মরণীয় ঘটনা। প্রধান মন্ত্রীর নাম হইলে 'পেশ্‌ওয়া'। তখন হইতে নিজামশাহী শাসন-তন্ত্রে হিন্দু মহারাষ্ট্রীয়েরা যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিল। এতকাল দলীল-দস্তাবেজ, নথী-পত্র ও হিসাবাদি পারস্ত

ভাষায় লিখিত হইত; ইব্রাহিম্ আদিল শাহ্-এর আমলে সর্ব্বপ্রথম বিজাপুর রাজ্যে এ প্রথা উঠাইয়া দিয়া মহারাষ্ট্র ভাষায় লিখিবার ব্যবস্থা করা হইল।

১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিজাপুর রাজ-সরকারে ও সৈন্যদলে বহু মহারাষ্ট্রে যোগ দিতে লাগিল। ইব্রাহিম আদিল শাহ্ বিদেশী সেনাদল ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে দেশীয় সৈন্যদল গঠন করিলেন। এই সময়ই "বর্গীর" নামক মহারাষ্ট্র অশ্বসাদী সৈন্যদলের সৃষ্টি হইল। পূর্ব্বে ছিল 'শিলীদার' অর্থাৎ যে ঘোড়-সওয়ার সেনা নিজের ঘোড়া নিজে যোগাইত। এখন হইতে নিয়ম হইল—রাজসরকার বা জায়গীরদার সৈন্যদের ঘোড়া কিনিয়া দিবেন; তাহাদের নাম হইল বর্গীর। এইরূপে ৩০,০০০ স্থায়ী বর্গীর সৈন্য বিজাপুরের মাহিনা খাইতে লাগিল। এই মারাঠী ঘোড়সওয়ারগণই পরবর্ত্তিকালে ভারতের সর্ব্বত্র 'বর্গী' নামে এত প্রসিদ্ধি লাভ করে।

বিজাপুর ও আহ্মেদনগরের অধীনে বহু পরগণায় মহারাষ্ট্রীয় দেশমুখগণ বাহাল্ ছিলেন। তাঁহাদের তাঁবে অনেক সময় বড় বড় জায়গীর ও কেল্লা থাকিত। জেলার কর্ত্তাকে 'মোক্‌দ্দার' বলা হইত। ইনি জেলার খাজনা হইতে একটা অংশ নিজের পারিশ্রমিক স্বরূপ কাটিয়া রাখিয়া, অবশিষ্টাংশ সুলতানের কোষাগারে পাঠাইয়া দিতেন। কোন কোন জেলার মোক্‌দ্দার মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ছিলেন। ক্রমে ক্রমে হিন্দু-মুসলমানে একটা সৌভ্রাত্রের সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গেল।

প্রথম প্রথম হিন্দুধর্ম্মের উপর কিছু অত্যাচার চলিলেও শেষে ধীরে ধীরে মস্‌জিদের পাশে উত্তুঙ্গ মন্দির মাথা উঁচু করিয়া উঠিল। সুলতানগণ বিশ্বাসী মোক্‌শুদ্দারগণকে ক্রমে ক্রমে 'রাজা', 'রাও', 'নায়েক' প্রভৃতি উপাধি দিয়া, তুষ্ট করিতে লাগিলেন।

দেবগিরির যাদব রাজবংশীয়দের এক বংশধর ছিলেন লাখোজী যাদব রাও; ইনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে আহ্‌মেদনগরের সুলতানের অধীনে সিন্দ্‌খেরের দেশমুখ ছিলেন। চতুর্দ্দিকে তাঁহার পসার-প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। তাঁহার আদেশ-প্রতীক্ষায় অন্যূন দশ হাজার ঘোড়্‌সওয়ার সৈন্য মোতায়েন্ থাকিত। দৌলতাবাদের নিকট ভিরোল নামক গ্রামের ভোঁস্‌লে পরিবার খুব সম্ভ্রান্ত ও বর্দ্ধিষ্ণু ছিলেন; এই পরিবারের অনেকেই সুখ্যাতির সহিত পাটেল্‌-গিরি করিয়া উপরিওয়ালার সুনজরে পড়িয়াছিলেন। যাদব রাওয়ের পরিবারের সহিত ইঁহাদের বন্ধুত্ব ছিল।

বৃদ্ধ পাটেল্ বাবাজী ভোঁস্‌লের দুই ছেলে; বড়টির নাম মল্লজী ও ছোটটির নাম বিটুজী। সুলতানের দেশমুখ যুগপাল্ রাও নিম্বল্‌করের ভগ্নী দীপাবাঈয়ের সহিত অল্পবয়সেই মল্লজীর বিবাহ হয়। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে পঁচিশ বৎসর বয়সে, লাখোজী যাদব রাওয়ের সহায়তায়, তিনি নিজাম শাহী সরকারে রাজধানীতে এক অশ্বারোহী দলের নায়ক হইলেন। ঘোড়াগুলির মালিক

ছিলেন তিনি নিজেই। বহু দিন পর্যন্ত তাঁহার সন্তান-সন্ততি হইল না দেখিয়া, তিনি সস্ত্রীক তুলজাপুরের প্রসিদ্ধ ভবানী দেবীর মন্দিরে, পূজা মানৎ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও যখন ফল হইল না, তখন তাঁহারা শাহ্‌ শরীফ্‌ নামক এক প্রসিদ্ধ পীরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। পীরের দোয়ায় ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে দীপাবাঈ এক বলিষ্ঠ পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। পীরের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইতে তাঁহারা পুত্রের নাম রাখিলেন শাহ্‌জী। পরবৎসরে আর একটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে, তাহার নাম রাখা হইল শরীফ্‌জী।

মল্লজী ক্রমশঃ রাজধানীর মধ্যে ও বাহিরে বেশ একটু নাম করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার বীরত্ব-খ্যাতির কথা সুলতান মুর্ত্তাজা নিজাম শাহ্‌রও কাণে উঠিয়াছিল। পদ-মর্য্যাদায় কিছু ছোট হইলেও মল্লজীর সহিত যাদব রাওয়ের বন্ধুত্ব বেশ পাকিয়া উঠিল। শাহ্‌জী তখন পাঁচ বৎসরের সুন্দর, সুপুষ্ট ও সচঞ্চল শিশু। হোলির নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে, মল্লজী তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে লইয়া পঞ্চম দোলের দিন যাদব রাওয়ের বাগান-বাটীতে উপস্থিত হইলেন। গান-বাজনা আমোদ-আহ্লাদে আসর সরগরম, ফাগুয়ার গুঁড়ায় সকলের দেহ লালে লাল।

শাহ্‌জীকে দেখিয়া যাদব রাওয়ের বড় পছন্দ হইল; তাহাকে নিকটে ডাকিয়া আদর করিয়া মুখচুম্বন করিলেন। পাশেই তাঁহার তিন বৎসরের কন্যা জীজীবাঈ বসিয়াছিল। ঠাট্টাচ্ছলে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁ মা, এই ছেলেটিকে

পিরে কর্‌বি ?' জীজী তাহার কৌতূহলপূর্ণ আয়ত চক্ষু শাহ্‌জীর দিকে ফিরাইয়া, অকপট সম্মতিতে ঈষৎ মাথা নাড়িল। কিছুক্ষণ পরেই শাহ্‌জী ও জীজীতে ভাব জমিয়া উঠিল। দুইজনে দুইজনের গায়ে মাথায় রঙ্‌ মাখাইয়া হাসিয়া লুটোপুটি খাইতে লাগিল। এই সময় মল্লজী ভোঁসলে সেই আনন্দ-মজ্‌লিসের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "ভাইসব, আপনারা শুনুন—আজ এই শুভদিনে আমার ছেলে শাহ্‌জীর সঙ্গে জীজীবাঈয়ের বিবাহ একপ্রকার পাকা হেয়ে' গেল।" সকলে "বেশ ত, বেশ ত" বলিয়া কলধ্বনি করিয়া উঠিলেন। যাদব রাও উহা ভোঁস্‌লের রঙ্গ ভাবিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে যাদব রাও একদিন মল্লজীকে নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু মল্লজী বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার পুত্রের সহিত জীজীর বিবাহ-সম্বন্ধ সত্যই পাকা হইল কিনা—তাহা জানিতে না পারিলে, তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু যাদব রাও দোলোৎসবের একটা অসার বিদ্রূপকে এতবড় একটা মহাবত্যে পরিণত করিতে চাহিলেন না। তাঁহার গর্ব্বিতা স্ত্রী, স্বামীর এই রঙ্গরসকে পর্য্যন্ত তীব্র ভাষায় নিন্দা করিলেন এবং পদমর্য্যাদা ও অর্থবলে হীন ওই ভোঁস্‌লে পরিবারে মেয়ে দেওয়ার কল্পনা করিতেও লজ্জিতা হইলেন।

কথিত আছে, এই প্রত্যাখ্যানে বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ না হইয়া, মল্লজী তাঁহার পরিবারবর্গকে লইয়া কিছুদিনের জন্য স্বগ্রামে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে স্বামিগ্রীতে দিবারাত্র কুলদেবী মা

ভবানীর পূজায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অবশেষে দেবী স্বপ্নে আবির্ভূতা হইয়া, তাঁহাদিগকে এক গুপ্ত ধনভাণ্ডারের সন্ধান বলিয়া দিলেন। তাঁহার আশা পূর্ণ হইবে ও তাঁহার বংশে এক স্বাধীন ও শঙ্করসদৃশ গুণবান্ নৃপতির উদ্ভব হইবে—এই আশীর্বাদ করিয়া দেবী অদৃশ্য হইলেন।

এই গুপ্ত ভাণ্ডারের অর্থে মল্লজী বহুতর অশ্ব কিনিয়া বাছা বাছা যোদ্ধা যোগাড় করিলেন এবং তাহাদিগকে সুলতানের সেবায় নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন। তাহা ছাড়া, গ্রামের চারিপার্শ্বে বহুতর কূপ, পুষ্করিণী খনন করিয়া এবং বহুতর মন্দির ও মসজিদে ইনাম দিয়া, তিনি হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের হৃদয় জয় করিয়া লইলেন। তারপর সুলতান তাঁহাকে পাঁচ হাজারী মনসবদার ও পুণা এবং সোপা পরগণার বিস্তৃত জায়গীর দান করিয়া, শিউনারী ও চাকুন্ দুর্গের অধীশ্বর করিয়া দিলেন। তাঁহার 'রাজা' উপাধিও সুলতান্ অনুমোদন করিলেন। যাদব রাও ও তাঁহার পত্নী দেখিলেন যে, তাঁহাদের কন্যা এখন ভোঁসলের ঘরে দিলে মান বাড়িবে ছাড়া কমিবে না। সুতরাং ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে বালক শাহজীর সহিত জীজীবাঈয়ের বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। বিবাহ-সভায় সুলতান স্বয়ং ওমরাহগণকে লইয়া উপস্থিত ছিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

মুঘলযুগে মহারাষ্ট্র

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে দিল্লী সাম্রাজ্যে পাঠান শাসন লুপ্ত হইয়া যায়। মুঘল জাতীয় বাবর দিল্লীর সম্রাট হইয়া গোয়ালিয়র পর্য্যন্ত সমগ্র হিন্দুস্থান শাসন করেন। পরবর্তী মুঘল সম্রাট হুমায়ুন বা আফগান সম্রাট শের শাহ্ কখনও নর্ম্মদার দক্ষিণে তাঁহাদের লুব্ধ দৃষ্টি প্রেরণ করেন নাই। তারপর আকবর সম্রাট হইয়া, রাজপুতানা, গুজরাট ও বাঙ্গালা দেশে মুঘলশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণে তাঁহার বিজয়-বাহিনী প্রেরণ করিলেন। প্রথমেই তাঁহার লক্ষ্যস্থল হইল খান্দেশ। খান্দেশের বেশীর ভাগ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমেই এক আফগান রাজার করলে পড়িয়াছিল; তাঁহাদেরই বংশধরগণ এখানে নিশ্চিন্ত সুখে রাজত্ব করিতেছিলেন। খান্দেশের সামান্য অংশ আহ্মেদ-নগরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আকবর সমস্ত খান্দেশটাই অধিকার করিয়া লইলেন। কাজেই আহ্মেদনগর রাজ্যের সহিত মুঘলদের গোলমাল পাকাইয়া উঠিল।...

রাজ্যসীমানা বৃদ্ধি লইয়া আহ্মেদনগর, গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্যত্রয়ের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া-ঝাঁটি, মারামারি, কাটাকাটি চলিত। ইহাতে এক এক সময় এক এক পক্ষ অত্যন্ত দুর্ব্বল

হইয়া পড়িয়াছিলেন। তদুপরি রাজসভায় ওমরাহদের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষাদ্বেষ ও দলাদলির অভাব ছিল না। সুলতানগণও ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া কিছু করিতে পারিতেন না। আহ্‌মেদনগর রাজ্যে এই সময় দুইটি দল প্রাধান্য লাভের চেষ্টায় ঘোরতর অন্তর্দ্বন্দ্বে ব্যাপৃত। রাজু নামক এক হিন্দু মন্ত্রীর একটা বিরাট দল ছিল। আবার সুলতানের হাবশী জাতীয়া বেগমের বাপ-ভাইদের একটা দল পাকাইয়া উঠিয়াছিল। মালিক অম্বর নামক একজন অমাত্য ইহার দলপতি হইয়াছিলেন।

আহ্‌মেদনগর ও বিজাপুরের ঝগড়া-বিবাদ যদি মিটিয়া যায় —এই আশায় সুলতান হুসেন্ নিজাম শাহ, বিজাপুর-রাজ আলি আদিল শাহ্‌র সহিত তাঁহার কন্যা চাঁদবিবির বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের যৌতুকস্বরূপ শোলাপুরের দুর্গ তিনি জামাতাকে দান করেন (১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে)। বিজাপুর-সুলতান বিনা আপত্তিতে এই বিবাহে যে সম্মতি দিয়াছিলেন, তাহারও একটা গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম হইতে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার নদীর দক্ষিণ ভাগ হইতে ভারতের শেষ সীমান্ত পর্য্যন্ত বিরাট ভূভাগে কানারী ভাষাভাষী দ্রাবিড় হিন্দুগণ বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বাহ্‌মানী রাজ্যের মুসলমান্ সম্রাটগণ ইহাদিগের কিছু ক্ষতি করিতে পারে নাই; বরং ইহারাই তাহাদের রাজ্য-বিস্তারে দেড় শতাব্দী ধরিয়া প্রবল বিক্রমে বাধা দিয়াছিল। ইহাদের ক্ষমতা রাজা কৃষ্ণরায় ও সদাশিব রায়ের সময় এত

বাড়িয়া উঠে যে, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার স্থান বিশেষ অধিকার বা লুণ্ঠন করিতে ইহারা ইতস্ততঃ করিত না। আবার বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও আহ্‌মেদনগরের মধ্যে যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিত, তখন ইহারা দুর্বলপক্ষে সৈন্য-সাহায্যও করিত।

বিজয়নগর রাজ্যকে পরে কর্ণাট রাজ্য বলা হইত; এখনও ইংরাজেরা কৃষ্ণার দক্ষিণস্থিত মহীশূরের করদ রাজ্য ব্যতীত সমগ্র মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীকে কার্ণাটিক বলিয়া থাকেন। যাহা হউক, বিজয়নগর ক্রমে ক্রমে যখন উত্তরস্থ সকল মুসলমান সুলতানের শত্রু হইয়া উঠিল, তখন তাহাকে ধ্বংস করিবার ইচ্ছা প্রত্যেকেই এককালে নিজের মনে পোষণ করিতে লাগিলেন। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার ভয় ছিল সবচেয়ে বেশী, কারণ বিজয়নগরের নিকট ক্ষতি হইতেছিল সবচেয়ে তাহাদেরই বেশী; সুতরাং এই দুই রাজ্য বিজয়নগরকে জব্দ করিতে জোট পাকাইল। বিদর রাজ্য তখনও কয়টি জেলা আঁকড়াইয়া ও বিজাপুরকে মুরুব্বি করিয়া, কোনমতে টিঁকিয়া ছিল। সে-ও বাধ্য হইয়া ইহাদের সহিত যোগ দিল। তারপর আহ্‌মেদনগরও আসিয়া যোগ দিল। চারি রাজ্যের মিলিত প্রায় আশী হাজার বাছা সৈন্য বিজয়নগর রাজ্য ধ্বংস করিতে উল্কা বেগে ছুটিয়া চলিল। বলা বাহুল্য, ইহার মধ্যে অনেক মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য ও সেনানায়ক ছিলেন। তালিকোট ও মুদ্গলের মধ্যস্থলে কৃষ্ণা নদীর তীরে বিজয়নগরের সহিত কয়মাস কালব্যাপী ভীষণ যুদ্ধ চলিল (১৫৬৫ সাল)। ইহার ফলে বিজয়নগর রাজ্য ধ্বংস হইয়া

গেল। হিন্দুর প্রাসাদ-মন্দির-শোভিত অপূর্ব্ব শোভাসম্পদশালী রাজধানী শ্মশানে পরিণত হইল।

ইহার পর আহ্‌মেদনগর রাজ্যে পূর্ব্ব হইতে যে ঘরোয়া বিবাদ চলিতেছিল, তাহা পুনরায় পূর্ণোদ্যমে সুরু হইয়া গেল। এদিকে বিজাপুর-রাজ আলি আদিল শাহ্ ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে নিহত হইলে, তাঁহার বিধবা মহিষী চাঁদবিবি শিশুপুত্র ইব্রাহিমের অভিভাবিকা স্বরূপ রাজ্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্ত্রীলোকের অধীনতা কেহই স্বীকার করিতে চাহিল না; দরবারে দলাদলির ঘোঁট ভীষণভাবে পাকাইয়া উঠিল। দেশীয় মুসলমান্ এবং বিদেশী—বিশেষতঃ পারসীক ও হাব্‌সী মুসলমানদের ভিতর বহুকাল হইতেই যে রেষারেষি চলিতেছিল, তাহা ইব্রাহিমের নাবালকত্বের সুযোগে দাবাগ্নির মত জ্বলিয়া উঠিল। চাঁদবিবি যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী, তেমনি আত্মনির্ভরশীলা ছিলেন। তিনি বিচক্ষণতার সহিত এই সকল দলাদলি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিলেন। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম সাবালক হইলেন, চাঁদবিবি পিত্রালয় আহ্‌মেদনগরে চলিয়া গেলেন।

আহ্‌মেদনগরেও দলাদলির অভাব ছিল না, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হিন্দুমন্ত্রীর দলে ক্রমশঃ দেশীয় মুসলমানগণ (অর্থাৎ যে সকল হিন্দু দুই চারি পুরুষের মধ্যে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে) আসিয়া দলপুষ্ট করিল। ওদিকে হাব্‌শী দলের হাতে সুলতানগণ উঠিতে-বসিতে লাগিলেন। দুই চারিজন মহারাষ্ট্র

সর্দার বাঁকিয়া বসিলেন। অত্যাচার, অবিচারের স্রোত বন্যার বেগে রাজ্যের সর্বত্র বহিয়া চলিল। তখন দুই চারিজন হিন্দু-মুসলমান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গোপনে মুঘল-সম্রাট আকবরের সৈন্য-বাহিনীকে রাজ্যের এই অরাজকতা বিদূরণে সহায়তা করিতে ডাকিলেন। তখন খাজেল-গৃহ শেষ করিয়া, আহ্‌মেদনগর-সরকারের কোন কার্যকরী প্রতিবাদ করিবার সময় না দিয়াই, মুঘল সৈন্যগণ বিদ্যুৎবেগে আহ্‌মেদনগর রাজধানীর উপর আসিয়া পড়িল।

পিতৃভূমি শত্রুকরতলগত হয় দেখিয়া বিধবা চাঁদ সুলতানা সমস্ত হিন্দু-মুসলমান লোককে একত্র করিয়া, তাহাদিগকে প্রাণপণে যুদ্ধ করিবার এক প্রাণোন্মাদিনী প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করিয়া দিলেন। নিজেই তিনি দুর্গের প্রাকারে দাঁড়াইয়া সেনাপতিগণকে সৈন্য-পরিচালনে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। রাজধানীর সমস্ত সৈন্য এক জোটে সমর-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িল। শত চেষ্টারও আকবরের সৈন্যদল আহ্‌মেদনগর দখল করিতে পারিল না, তাহারা পরাজয়ের লাঞ্ছনা মাথায় সহিয়া ফিরিয়া আসিল। কিছুদিনের জন্য আহ্‌মেদনগরের পাঠান-স্বাধীনতা, চাঁদের তেজোদীপ্তিতে, রক্ষিত হইল।

কিন্তু অকৃতজ্ঞ হাব্‌শী ওম্‌রাহগণ বিজাপুর-কুল-বধূ চাঁদের এ প্রভাব-গৌরব বরদাস্ত করিতে পারিল না। ঘৃণ্য চক্রান্তে পড়িয়া চাঁদ অচিরে গুপ্ত ঘাতকের হাতে প্রাণ দিলেন। রাজ্যের প্রাণ গেল, দেহ পড়িয়া রহিল। প্রতীক্ষমান্ মুঘল শকুনী তাহার উপর উড়িয়া আসিয়া বসিল। হাব্‌শী দলের সর্দার মালিক অম্বর



নিজেই তিনি দুর্গের প্রাচীরে দাঁড়াইয়া সেনাপতিগণকে সৈন্য-পরিচালনে
উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

[মহারাষ্ট্র—৭০ পৃষ্ঠা]

খুব প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন; তিনি মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করিতে উদ্যোগের অন্ত রাখিলেন না। কিন্তু চাঁদের সঙ্গে সঙ্গে পাঠানের সৌভাগ্য-সূর্য্য চিরতরে অস্তমিত হইয়াছে। আহ্‌মেদনগর রাজধানী মুঘলের করায়ত্ত হইল। নিজাম-শাহী বালক সুলতানকে বন্দী করিয়া, গোয়ালিয়র দুর্গে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

রাজধানী গেল, কিন্তু রাজ্য গেল না। মালিক অম্বর তখন দলবল সৈন্য-সামন্ত সঙ্গে লইয়া পুরাতন রাজধানী দৌলতাবাদের নিকটে ক্ষীরকী নামক গ্রামে আসিয়া আড্ডা গাড়িলেন। পরবর্ত্তী কালে এই ক্ষীরকীর নামই আওরাঙ্গাবাদ হয়। ক্ষীরকীতে তাড়াতাড়ি কয়েকখানা ছোটবড় অট্টালিকা গড়িয়া তোলা হইল। এখানে মালেক অম্বর, প্রধান মন্ত্রিরূপে দ্বিতীয় মূর্ত্তাজা নিজাম শাহ্‌কে সিংহাসনে বসাইয়া, দুর্গের উপর বেহারী বংশের স্বাধীনতা-নিশান উড়াইয়া দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্যের সম্মান ও প্রতিপত্তি ফিরিয়া আসিল। তারপর বিশ বৎসর কাল মুঘলগণ আহ্‌মেদনগরের নূতনতম রাজধানী দখল করিবার প্রভূত চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

মালেক অম্বর গোড়াগুড়ি হইতেই মহারাষ্ট্রীয় অমাত্য ও সৈন্যাধ্যক্ষদিগের উপর প্রসন্ন ছিলেন না। কিন্তু ইহাদের সহযোগিতা অভাবে রাজ্য চলে না দেখিয়া, তিনি মনের কাল মনেই রাখিয়া দিলেন। নূতন রাজধানী পত্তন করিবার পর বরং

মহারাষ্ট্রগণকে খুশী রাখিবার জন্য তাঁহাদিগকে নূতন নূতন সুবিধা ছাড়িয়া দিতে হইল। মালেক রাজস্ব-বিভাগে বহু নূতন প্রথার প্রবর্তন করিলেন। তাঁহার শাসন-গুণে রাজ্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইল। ভূতপূর্ব্ব নিজামশাহী সরকারে লাখোজী যাদব রাওয়ের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু নানাকারণে এই প্রতিপত্তি খর্ব্ব করিতে গিয়া, বৃদ্ধ মালেক অম্বর তাঁহার সহিত ঝগড়া বাধাইয়া বসিলেন। তখন যাদব রাও ১৬২১ খৃষ্টাব্দে সানুচর মুঘলদের দলে গিয়া যোগ দিলেন। মুঘলগণ তাঁহাকে সসম্মানে গ্রহণ করিলেন এবং নূতন নূতন জায়গীর সমেত চব্বিশ হাজারী মনসব্‌দারের পদ দান করিলেন।

কিন্তু তাঁহার বেহাই মল্লজী ভোঁসলে মালেক অম্বরের দলে মৃত্যু পর্য্যন্ত রহিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহজী ভোঁসলে পিতার চাকুরীতে বহাল্‌ হইয়াছিলেন। ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে শাহজী যথেষ্ট বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে শাহ্‌জীর মামা ধুসপাল নিহত হন। যাদব রাও আহ্‌মেদনগর রাজ্যের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করায় মালেক অম্বর নিজেকে বেশ একটু অসহায় মনে করিলেন। তাহার পর হইতে তিনি মহারাষ্ট্র নায়ক ও দেশমুখদের যথেষ্ট খাতির করিতে লাগিলেন। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে মুঘলদের সহিত একটা বড় রকমের যুদ্ধ-আয়োজন সম্পূর্ণ করিবার কালে মালিক অম্বরের মৃত্যু হয়।

এইবার দুই চারি কথায় বিজাপুরের কথা একটু বলিয়া

লই। চাঁদবিবির পুত্র ইব্রাহিম প্রথম বয়সে একটু বিলাসী ও বিষয়-কর্মে উদাসীন ছিলেন। তারপর মুঘলেরা যখন প্রতিবেশী আহ্মেদনগরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাঁহার চৈতন্যের উদয় হইল। তিনি বজ্রকঠোর হস্তে শাসন-দণ্ড গ্রহণ করিলেন; দুষ্ট মন্ত্রীদিগকে একে একে তাড়াইয়া দিলেন এবং রাজ্যের মধ্যে চমৎকার শৃঙ্খলা আনয়ন করিলেন। ওদিকে আহ্মেদনগর রাজধানী ও তাহার চারিপার্শ্বের কয়েকটি জেলা দখল করিয়া লইয়া, মুঘল সেনাপতিদের নজর গিয়া পড়িল বিজাপুরের স্বর্ণ-সিংহাসনের উপর। ব্যাপার আগে হইতেই অনুমান করিয়া, ইব্রাহিম আদিল শাহ মুঘলদের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। সন্ধি উভয়পক্ষেই অল্পবিস্তর সম্মানজনক সর্ত্তে স্থাপিত হইল।

সন্ধি করার আরও একটা কারণ ছিল। আহ্মেদনগর রাজ্য বরাবরই তাঁহার পৈত্রিক রাজ্যের সহিত কলহ করিয়া আসিতেছে; এমন কি, তাঁহার পিতা আলি আদিল শাহ্ শোলাপুরের যে দুর্গ বিবাহের যৌতুক স্বরূপ পাইয়াছিলেন, তাহাও মালেক অম্বর গ্রাস করিয়া বসিয়াছিলেন। মুঘলরা ইব্রাহিমকে শুধু শোলাপুরের দুর্গ নহে, তাহার পূর্ব্বে বিদররাজ্য-সীমান্ত পর্য্যন্ত আরও পাঁচ ছয়টি দুর্গ জয় করিয়া দিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিলেন।

এইবার আবার আহ্মেদনগর রাজ্যে ফিরিয়া আসা যাক্। দ্বিতীয় মুর্ত্তাজা নিজাম শাহ্ সেই কিশোর বয়সে সুলতান হওয়া

অবধি এতদিন মালেক্ অম্বরের খেলার পুতুল ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সুলতান্ একটু হাঁফ্ ছাড়িবেন—মনে করিতেছেন, এমন সময় মালেক অম্বরের পুত্র ফতে খাঁ প্রধান উজীরের পদে কায়েম হইয়া বসিলেন। কথায় বলে—বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়, ফতে খাঁ-ও হইলেন সেই রকম। তাঁহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া মুর্ত্তাজা তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

দাক্ষিণাত্যে মুঘল অধিকারের শাসন-কর্তা ছিলেন খাঁ জাহান লোদী। ইনি জাতিতে আফ্‌গান ছিলেন ও দিল্লীর সম্রাট্‌কে নিয়মমত খাজ্‌না পাঠাইতেন না বলিয়া সম্রাট শাহ্‌জাহান্ তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাকে মালবে বদলী হইবার হুকুম দিয়া, সম্রাট্ খাঁ জাহানকে রাজধানীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। খাঁ জাহান মালব পর্য্যন্ত গিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, সম্রাট্ তাঁহাকে শাস্তি দিতেই নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। কাজেই তিনি পাছু ফিরিয়া দাক্ষিণাত্যে নিজামশাহী রাজ্যে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। তাঁহাকে পাক্‌ড়াও করিবার জন্য তিনজন পাকা সেনাপতির অধীনে তিন দল সৈন্য লইয়া, শাহ্‌জাহান নিজে দাক্ষিণাত্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন (১৬২৯ খৃঃ অঃ)।

তিন দিক হইতে সম্মিলিত গতিতে অসংখ্য মোগল বাহিনী আহ্‌মেদনগর রাজ্যের নূতন রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইল। ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া মুর্ত্তাজা নিজাম্ শাহ তাঁহার হিন্দু-মুসলমান্ সেনাপতিদের মুঘল আক্রমণের পাল্টা জবাব দিতে যুদ্ধক্ষেত্রে

পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু যাহার জন্য যুদ্ধ—সেই খাঁ জাহান বিজাপুর রাজ্যের দিকে পলাইয়া গেলেন। তখন আহ্মেদ-নগরীয় সেনাপতিগণ মনে করিলেন—এইবার বোধ হয় মুঘলেরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া বিজাপুরের দিকে দৌড়িবে। কিন্তু মুঘলের শাণিত তরবারী তাহাদেরই মস্তকোপরি উদ্যত হইল দেখিয়া তাঁহারা হতাশ হইয়া পড়িলেন। অনেকে যুদ্ধ-জয়ের আশা পরিত্যাগ করিয়া, পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিল। শাহ্জী ভোঁস্লে বেগতিক দেখিয়া তখনকার মত উপযাচক হইয়া মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। মুঘল সেনাপতি আজিম খাঁ, সম্রাটের হইয়া, তাঁহাকে ছয় হাজারী মনসব্দার করিয়া দিলেন এবং তাঁহার পুরাতন জায়গীর ছাড়া আহ্মেদনগর সন্নিহিত আরও কয়েকটি জেলায় তাঁহার মুকদ্দমদারী স্বীকার করিলেন।

বিজাপুর রাজ্য মুঘলের মিত্র; সুতরাং আশ্রয়প্রার্থী খাঁ জাহান লোদীর অনুনয়-বিনয়ে কোন ফল হইল না। সেখান হইতে তিনি পুনরায় ক্ষীর্কীতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। এবার যুদ্ধ বেশ ঘোরতর রকমের বাধিয়া উঠিল। আজিম খাঁ বহু সৈন্যক্ষয় করিয়া, অবশেষে ক্ষীর্কী দখল করিলেন। তারপর মুঘল সেনাপতি জেলার পর জেলা, দুর্গের পর দুর্গ জয় করিতে করিতে একেবারে ক্ষীর্কীর দক্ষিণ-পশ্চিম-স্থিত ধারুরের দুর্জয় কেল্লা পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া ফেলিলেন। মূর্ত্তাজা নিজাম শাহ্ এই ঘোর বিপদে জ্ঞানহারা হইয়া, ফতেখাঁকে কারামুক্ত করিয়া, সকাতরে তাঁহার সহযোগিতা-ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু সাহায্য

কথা দূরে থাকুক, দুর্বিনীত ফতে খাঁ প্রভুকে কারাগারে পুরিয়া, ফাঁসীকাষ্ঠে চড়াইয়া দিলেন।

বিজাপুরের সহিত মুঘলের আপোষ-সান্ধর একটা সর্ত্ত ছিল এই যে, তাঁহারা শোলাপুর হইতে ধারুর পর্য্যন্ত পাঁচ-ছয়টি দুর্গ তাঁহার অনুকূলে জয় করিয়া দিবেন। ইব্রাহিম আদিল শাহ তখন পরলোকে। তাঁহার যুবক পুত্র তখন মুঘল সেনাপতিকে ধারুর দুর্গ তাঁহার প্রতিনিধির হস্তে ছাড়িয়া দিতে একটা মিঠে-কড়া গোছের তাগিদ দিলেন। 'পরে বিবেচ্য' বলিয়া মুঘলেরা সে তাগিদ উপেক্ষা করায়, বিজাপুর সুলতান নিজের সম্ভ্রম রাখিতে বাধ্য হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

এই সময় শাহজী মোগল শাসন-কর্ত্তার অনুমতি লইয়া বিজাপুর-রাজসরকারে চাকরী করিতেছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে দুষ্ট ফতে খাঁ সম্রাট শাহজাহানকে বহুতর হস্তী ও বহুমূল্য হীরা-জহরৎ উপহারে সন্তুষ্ট করিয়া, আহমেদনগর রাজ্যের অ-জিত কয়েকটি জেলায় মূর্ত্তাজা নিজাম্ শাহের এক বালকপুত্রকে সুলতান বানাইয়া, সনাতন উজীরী পেশায় মন দিয়াছিলেন। ক্ষীরকীতে তখন মুঘলদের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি বসিয়াছে। বিজাপুর সৈন্যদল পথিমধ্যে কয়েকটি মোগল দুর্গ দখল করিয়া, একেবারে ক্ষীরকীর খিড়কীতে আসিয়া হানা দিল। বিজাপুরী সৈন্যদলে শাহজীও অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। এই সময় দুষ্টতুর ফতে খাঁ হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের আশায় তাঁহার দলবল লইয়া আসিয়া, বিজাপুরী বাহিনীর সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি করিলেন। চুয়াম দিন

ধরিয়া যুদ্ধের পর, রসদ ফুরাইয়া যাওয়ায়, বিজাপুর ও আহ্‌মেদ-নগরের সম্মিলিত সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ফলে খাঁ ও তাঁহার হস্ত-চালিত বালক সুলতান মুঘলের হাতে বন্দী হইলেন। গোবেচারী সুলতান শেষে আজীবন গোয়ালিয়র দুর্গে আটক হইয়া রহিলেন।

বিজাপুরী সৈন্যদল কিন্তু তাহাদের শৃঙ্খলা যথাসাধ্য বজায় রাখিয়া, যুদ্ধ করিতে করিতে, ধীরে ধীরে পিছু হঠিতে লাগিল। মুঘল সেনাপতি মোহব্বৎ খাঁ তাহাদিগকে তাড়া করিয়া অনেক দূর হঠাইয়া আনিলেন বটে, কিন্তু একটা স্থান-নিবদ্ধ নিশ্চিত যুদ্ধে টানিয়া আনিয়া, তাহাদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার সুযোগ পাইলেন না। এই সময় সম্রাট শাহ্‌জাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহ্‌সুজা দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হইয়া আসিলেন। তখন দৌলতাবাদের অনেকাংশ একটা অনিশ্চয় বিশৃঙ্খলার মধ্যে; বিজাপুরের সহিত যুদ্ধও প্রায় অচল হইয়া রহিয়াছে। কিছুদিন পরে বিজাপুর-সুলতান্ মোহাম্মদ্ আদিল শাহ্‌, মোগল-অধিকৃত দুর্ভেদ্য পুরন্দর দুর্গ কাড়িয়া লইলেন। শাহ্‌সুজা ও মোহব্বৎ খাঁ দুর্গ অবরোধ করিয়া কিছু করিতে পারিলেন না। বরং বিজাপুরের আফ্‌গানী ও মারাঠী সৈন্যদলের দাপটে অস্থির হইয়া, তাঁহারা বুর্হানপুরে পলাইয়া গিয়া রক্ষা পাইলেন।

এই গোলমালের মধ্যে শাহ্‌জী ভোঁসলে ফাঁকতালে রহিয়া গিয়া এক অসম্ভব কাণ্ড ঘটাইয়া বসিলেন। তিনি তলে তলে কতকগুলি মারাঠী দেশমুখ ও কেল্লাদারদের স্ববশে আনিয়া,

মুর্ত্তাজা নিজামের আর এক বালক পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া, নবপ্রাণপ্রাপ্ত আহ্মেদনগরের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। বৎসর খানেক পর্য্যন্ত মুঘলেরা তাঁহার উগ্র প্রতাপের কাছে ঘেঁষিতে পারিলেন না। শেষে যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, কঙ্কনের উত্তরার্দ্ধ এবং চন্দোর শৈলমালার পাদদেশ হইতে দক্ষিণে নীরা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজ্য শাহ্জীর এলাকাভুক্ত হইয়া পড়িল; যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, বিজাপুরের প্রধান মন্ত্রী মোরার পন্থ শাহ্জীকে সগর্ব্বে উস্কাইয়া দিতেছেন, তখন সম্রাট্ শাহ্জাহান ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। আট্চল্লিশ হাজার শ্রেষ্ঠ ঘোড়্সওয়ার সৈন্য লইয়া তিনি পুনরায় দাক্ষিণাত্যে আসিলেন। সমস্ত বাহিনী তিনি চারিদলে বিভক্ত করিয়া, সায়েস্তা খাঁ, আলিবর্দ্দী খাঁ, খাঁ জমান ও খাঁ দৌরাণ্-এর আজ্ঞাধীনে রাখিলেন। দুই দল বিজাপুর, অন্য দুইদল আহ্মেদনগর ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইল (১৬৩৫ খৃঃ অঃ)।

বিজাপুরের সহিত মুঘল-সম্রাটের এক বৎসরের উপর যুদ্ধ চলিয়াছিল। নানা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া মুঘল সৈন্য বিজাপুরের নলদুর্গ, কল্যাণী, বিদর প্রভৃতি স্থান হস্তগত করিল; আহ্মেদনগরের নাসিক ও চন্দোর জেলা কাড়িয়া লইল। তারপর খাঁ জমান সঙ্গমনীর, চুমারগণ্ডী, বড়্মাট্টি প্রভৃতি একে একে অধিকার করিয়া, সসৈন্যে শাহ্জীর পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে, একেবারে বিজাপুরের রাজ্য-সীমানায় আসিয়া পৌঁছিলেন। ওদিকে সহ্যাদ্রির দুরারোহ শৈলগাত্রে ত্র্যম্বক, শিউনারী,

কোন্দনা প্রভৃতি দুর্গ শাহজীর অনুচরগণ দখল করিয়া রহিলেন। এদিকে শাহজী বিজাপুরের সৈন্য-সাহায্য পাইয়া মুঘলদের নাকের জলে চোখের জলে করিতে লাগিলেন। নিষ্ফল আক্রোশে সেনাপতি খাঁ জমান কোলাপুর, মিরাজ, রাইবাগ প্রভৃতি স্থানের হাজার হাজার নিরীহ অধিবাসীদের প্রাণবধ করিয়া, ঘর-দ্বার জ্বালাইয়া, শস্য লুট করিয়া, গায়ের জ্বালা মিটাইতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে, খান্দেশ হইতে খাঁ দৌরাণ দৌলতাবাদ, ভির, গুলবর্গা অতিক্রম করিয়া, অতর্কিতে বিজাপুর রাজধানীর অনতিদূরে আসিয়া দেখা দিলেন। মোহাম্মদ আদিল শাহ্ সমস্ত সৈন্য ও রাজকর্মচারী লইয়া দুর্গের ভিতর আশ্রয় লইলেন ; তৎপূর্ব্বে তিনি সাধ্যমত শস্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া, বাদবাকী ক্ষেত্রের উপরেই আগুণ ধরাইয়া পুড়াইয়া দিতে আদেশ করিলেন। খোন নদী হইতে সমস্ত নৌকা ডাঙ্গায় উঠাইয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। দুর্গের গভীরতম গড়খাই হইতে সমস্ত জল বাহির করিয়া দেওয়া হইল। দেখিয়া-শুনিয়া দৌরাণ আর রাজধানী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন না। রাজধানীর বাহিরে থাকিয়া, বিজাপুর সেনাপতি রণদৌলা খাঁর সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিতে ও সমীপবর্ত্তী গ্রামসমূহ ধ্বংস করিতে লাগিলেন। অবশেষে উভয় পক্ষই ক্রমে নির্বীর্য্য হইয়া পড়িল।

মোহাম্মদ আদিল সন্ধির প্রস্তাব করিতে না করিতেই, তাহা মুঘল পক্ষ লুফিয়া লইলেন। ওই সন্ধির ফলে শোলাপুর, পুরন্দর

প্রভৃতি দুর্গ বিজাপুরকে তৎক্ষণাৎ ফিরাইয়া দেওয়া হইল। কল্যাণ জেলা এবং ভীমার কূল হইতে চাকুন জেলা পর্য্যন্ত আহ্‌মেদনগর রাজ্যের অংশ বিশেষ বিজাপুর-রাজ উপরন্তু লাভ করিলেন। এই সকল সুবিধা ও স্বত্ব উপভোগের জন্য বিজাপুর বাৎসরিক কুড়ি লক্ষ 'পাগোদা' (একপ্রকার ক্ষুদ্র স্বর্ণমুদ্রা, একটি প্রায় চারি টাকার সমান) মুঘল-রাজকোষে দিতে স্বীকৃত হইল। শাহ্‌জী নিজের অধিকারস্থ দুর্গগুলি অস্ত্রশস্ত্র সমেত মুঘলের হাতে তুলিয়া দিলে, তিনি সম্রাটের ক্ষমা পাইবেন —এইরূপ প্রতিশ্রুতিও সন্ধিপত্রে লিখিত হইল।

ইহার পরও শাহ্‌জী কয়েক মাস অদম্য উৎসাহে যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। শেষে যখন ত্র্যম্বক, শিউনারী (জুন্নার), প্রভৃতি স্থানের সর্দারগণ অবরোধে হতবল হইয়া পড়িলেন, তখন শাহ্‌জী হার মানিয়া, মুঘলের নিকট মাফ্‌ চাহিলেন (১৬৩৭ খৃঃ অঃ)। তারপর মুঘল-সম্রাটের ইচ্ছায় তিনি বিজাপুরের চাকুরীতে পুনরায় বাহাল হইলেন এবং প্রৌঢ়ত্বের মধ্যস্থলে পৌঁছাইয়াও অল্পদিনের মধ্যে রাজ্যের দ্বিতীয় সেনাপতির পদে উন্নীত হইলেন।

আহ্‌মেদনগর রাজ্য পুরাপুরি দিল্লী সম্রাটের খাশ্‌ হইয়া গেল। শাহ্‌জীর স্বহস্তনির্ম্মিত সুলতান্ বেচারা গোয়ালার দুর্গে পূর্ব্বের সুলতানের ন্যায় চিরনির্ব্বাসিত হইলেন।

গোলকুণ্ডার ইতিহাসের সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না রাখিলেও চলিবে; কারণ ইহার অতি অল্প অংশেই মহারাষ্ট্র

জাতির বাস ছিল। কেবল এইটুকু জানিয়া রাখিলে চলিবে যে, গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধেও শাহ্‌জাহান্‌ অভিযান্‌ করিয়াছিলেন। কয়েকটি ছোটখাটো যুদ্ধের পর, গোলকুণ্ডা অবনত হইয়া একটা ভারী রকমের বাৎসরিক কর দিতে স্বীকার করিয়াছিল। এই রাজ্যের কিছু অংশ আহ্‌মেদনগর ও বিজাপুরের হিস্যায় চলিয়া যায়। ইহার পরও কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত গোলকুণ্ডা রাজ্য করদরূপে একরূপ টিঁকিয়া ছিল; তারপর সম্রাট্‌ ঔরঙ্গজেব আসিয়া একেবারে ইহার অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিলেন।

নবম অধ্যায়

স্বাধীনতার বীজ-রোপণ

মুঘলের সহিত সন্ধির ফলে পুনা, সোপা, ভোর প্রভৃতি জেলা বিজাপুরের সামিল হইয়াছিল। পুনা ও সোপা জেলায় শাহজীর বিস্তৃত পৈত্রিক জায়গীর ছিল। তিনি সেগুলি ফিরিয়া পাইলেন; তাহা ছাড়া মন্ত্রী মোরার পন্থকে নবলব্ধ রাজ্যাংশের বিলি-বন্দোবস্ত বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করায়, সুলতানের নিকট হইতে বহুবিধ ইনাম্ পাইলেন।

তালিকোটের যুদ্ধের পর বিজয়নগর রাজ্যের অধিকাংশ বিজাপুর, আহ্‌মেদনগর ও গোলকুণ্ডার ন্যায়তঃ অধিকারে আসিয়াছিল বটে; কিন্তু তাহা নিয়মমত কখনও ভাগাভাগি করাও হয় নাই—তথায় শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষার যথোচিত সুবন্দোবস্ত করাও হয় নাই। কাজেই এ অবস্থায় স্থানীয় জমিদারগণ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজারা প্রজার ষোল আনা খাজনাই তোফা আরামে ভোগ করিতেছিলেন। অতঃপর রণদৌলা খাঁ ও শাহ্‌জী একদল সৈন্য লইয়া বাঙ্গালোরের দক্ষিণ পর্য্যন্ত দেশে বিজাপুরের অধিকার কায়েম্ করিয়া আসিলেন। সেখানেও শাহ্‌জী বিভিন্ন জেলার বহু লোভনীয় জায়গীর লাভ করিলেন। উপরন্তু বর্ত্তমান শোলাপুরের অনেক স্থান এবং কারাড্ জেলার বাইশটি গ্রাম তাঁহার

বিস্তৃত জমিদারীর মধ্যে আসিয়া পড়িল। সবগুলি একত্র করিলে, একটা বেশ শাঁসালো রকমের রাজ্য হইয়া দাঁড়ায়। বিপুল বিজাপুর রাজ্যে সুলতানের নীচেই তিনজন শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি উহার ভাগ্যবিধাতা হইয়াছিলেন। মন্ত্রী মোরারপন্থ সেনাপতি রণদ্দৌলা খাঁ এবং সহকারী সেনাপতি দেশনায়ক শাহ্‌জী ভোঁসলে।

১৬৩০ খৃষ্টাব্দে শাহ্‌জী পুনরা বিবাহ করিয়াছিলেন; কারণ যাদবদের সহিত তাঁহার মোটেই বনিবনাও ছিল না। প্রথমা পত্নী জীজীবাঈয়ের গর্ভে দুই ছেলে—শম্ভুজী ও শিবাজী। কিশোর শম্ভুজীকে তাঁহার পিতা কর্ণাট দেশের জায়গীরগুলির তত্ত্বাবধান করিতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। স্বামীর দ্বিতীয়বার বিবাহের পর জীজীবাঈ তাঁহার ছোট ছেলে শিবাজীকে লইয়া মাতুলালয়ে প্রস্থান করেন। দ্বিতীয়া পত্নী তুকাবাঈ মোহিতের গর্ভে শাহ্‌জীর আর এক পুত্র হইল, তাহার নাম বঙ্কজী।

জীজীবাঈয়ের ললাটে স্বামীসুখ লেখা ছিল না। কুড়ি বৎসর বয়স হইতেই শাহ্‌জী কঠোর রাজকার্য্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিলেন; একাদিক্রমে দুই মাস কাল পারিবারিক স্নিগ্ধতার মধ্যে বিশ্রাম লইবার তাঁহার অবসর ছিল না। জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্দ্ধাংশই তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর ভৈরব কল-কোলাহলের মধ্যে কাটাইতে হইয়াছে। ১৬২১ খৃষ্টাব্দে লাখোজী যাদব রাও আহ্‌মেদনগরের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া মুঘলদের সঙ্গে যোগ দিবার সময় বেহাইকেও জামাতা

শাহ্‌জীকে মুঘলদের দলে আসিতে অনুরোধ করেন। সে কথায় তাঁহারা তখন কর্ণপাত করেন নাই। কিন্তু জামাইয়ের অবাধ্যতায় যাদব রাও হাড়ে হাড়ে চটিয়া গিয়াছিলেন। শাহ্‌জীও ইহার পর আর জীজীবাঈকে আর পিত্রালয়ে পাঠাইতে চাহেন নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৬২৬ সালে মালেক অম্বর মারা গেলে, তাঁহার পুত্র ফতে খাঁ কিছুদিন সুলতানের উপর ভীষণ প্রভুত্ব সুরু করিয়া দিয়াছিলেন। মুঘলদের সহিত তখনও যুদ্ধ চলিতেছিল এবং এই সকল যুদ্ধে তকরুব্বির খাঁ ও শাহ্‌জীই ছিলেন প্রধান। ১৬২৭ সালের প্রথমেই রাজধানী আহ্‌মেদনগর হইতে মুঘলদের উচ্ছেদ করিবার জন্য এক বিরাট যুদ্ধের আয়োজন হয়। মুঘলদের সেনাপতি ও দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা খাঁ জাহান লোদী যাদব রাওকে সঙ্গে লইয়া সদর্পে আসরে নামিলেন। যুদ্ধে প্রথম প্রথম আহ্‌মেদনগরীদের জয় হইতেছিল, শেষে ফতে খাঁর নির্ব্বুদ্ধিতায় তাহাতে হার হইয়া গেল।

বীতশ্রদ্ধ হইয়া, শাহ্‌জী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়াই জীজীবাঈকে লইয়া বিজাপুরের দিকে রওনা হইলেন। পথিমধ্যে যাদব রাও দলবল লইয়া শাহ্‌জীকে আচম্বিতে আক্রমণ করিলেন। জীজীবাঈ তখন গর্ভবতী। জীজীবাঈকে ফেলিয়া, শাহ্‌জী জীজুরীর দিকে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। সাধ্বী জীজী স্বামীর অনুগমন করিতে চাহিলেন; কিন্তু যাদব রাও কন্যাকে জোর করিয়া জুন্নারে লইয়া গেলেন। সেখানে শিউনারী দুর্গমধ্যে ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে বৈশাখী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে

বৃহস্পতিবার শাহ্‌জীর দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয়। দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী শিবনারী অর্থাৎ শিবার নামে পুত্রের নাম রাখা হইল শিবাজী। বাসুদেব-সদৃশ পুত্রটিকে কোলে লইয়া, তিনি পিত্রালয়ে পরাধীনতার জ্বালা ভুলিয়া গেলেন।

তিন বৎসর পরে যাদবরাও যখন মুঘল পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, পুনরায় আহ্‌মেদনগর-সুলতানের দরবারে ফিরিয়া আসিতে চাহিলেন, তখন জীজী মুক্তি পাইলেন। বুঝি এইবার স্বামিপুত্রের সহবাসে জীবনের বাকী কয়টা দিন অপরিসীম সুখশান্তিতে কাটিয়া যাইবে,—এই আশায় দুঃখিনী জীজী শাহ্‌জীর সংসারে প্রবেশ করিতে না করিতেই তাঁহার এক সপত্নী আসিয়া জুটিল। চক্ষের জল মুছিয়া, তিন বৎসর বয়স্ক শিবাজীকে বুকে তুলিয়া, তিনি পুনরায় স্বামিগৃহ ছাড়িয়া চলিলেন। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দের শেষদিকে শাহ্‌জী যখন বিজাপুর-রাজের আদেশে কর্ণাট-বিজয়ে বহির্গত হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, সেই সময় জীজী বালক শিবাজীর বিবাহ উপলক্ষ করিয়া, কয়েক দিনের জন্য পুনরায় স্বামীর সংসারে আসিলেন।

মহাধূমধামের মধ্যে নিম্বলকর-কন্যা সইবাঈ (সঈবাঈ)-এর সহিত দশবৎসর বয়স্ক শিবাজীর বিবাহ হইয়া গেল। ইহার পর পরিবারবর্গকে পুনায় নিজ জায়গীরে পাঠাইয়া দিয়া, শাহ্‌জী কর্ণাট যাত্রা করিলেন। পুনার বিষয়-সম্পত্তির তদারক করিতেন দাদাজী কণ্ডদেও নামক এক ব্রাহ্মণ। বড় বড় জায়গীর ও জমিদারীর তত্ত্বাবধান করা ও হিসাব-পত্র রাখায়

ভার ছিল তখন ব্রাহ্মণদের উপর। ইঁহাদিগকে 'কারকুন' বলা হইত। ইঁহারা হিন্দুরাজ্যের দাওয়ানের মত সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, প্রভুর তরফ্ হইতে রাজ-দরবারে ওকালতি করিতেও যাইতেন।

জুন্নারের দক্ষিণ হইতে পুনার দক্ষিণ-পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইন্দাপুর ও বড়মাট্টি জেলা সমেত গিরিমৌলিস্থানকে মাওয়াল্ বলিত; এইস্থান মাওয়ালী নামক এক পার্ব্বত্য মারাঠা জাতির সনাতন বাসভূমি। প্রায় সমস্ত মাওয়ালটাই শাহ্জীর এলাকাভুক্ত ছিল। ইহারা হিন্দু বা মুসলমান কোন জায়গীরদারেরই বেশী দিন আজ্ঞাধীন হইয়া থাকিতে চাহিত না। কিন্তু দাদাজী কণ্‌দেও আপন অমায়িক ব্যবহারে মাওয়ালীদিগকে অকৃত্রিম বন্ধু করিয়া ফেলিলেন। মাওয়ালীদিগের মধ্য হইতে শিবাজীরও কয়েকজন প্রাণের বন্ধু জুটিয়া গেল।

তখন ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন শ্রেণী বড় একটা লেখা-পড়া শিখিত না। ক্বচিৎ কোন ক্ষত্রিয় রাজা বা প্রতিভাবান্ দেশমুখ একটু-আধটু লেখাপড়ার চর্চ্চা করিতেন। জীজীবাঈ রাজবংশের মেয়ে, যৎসামান্য কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি শিবাজীকে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত গীতা সুর করিয়া পড়িয়া শুনাইতেন। বালকের স্মরণ-শক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। দুই একবার শুনিয়াই তাঁহার বহু শ্লোক কণ্ঠস্থ হইয়া গেল। দাদাজী কণ্‌দেবও অবসর পাইলেই তাঁহাকে অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্রের ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন।

সীতার বনবাস-কথা শুনিয়া শিবাজী যেমন কাঁদিয়া আকুল হইতেন, আবার কর্ণার্জ্জুনের বীরত্ব কাহিনী শুনিয়া তেমনি আনন্দের উম্মাদনায় অস্থির হইয়া পড়িতেন। তরুণ মানসে ভাবুকতা ও বীরত্বের বীজ এমনি করিয়া রোপিত হইল।

ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ছিল তখন অস্ত্রে। দাদাজী কণ্‌দেও তাহার সুবন্দোবস্ত করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বর্শা, খড়্‌গ ও কিরীচ চালনায় কিশোর বয়সেই শিবাজী এরূপ অদ্ভুত নৈপুণ্য লাভ করিলেন যে, দাদাজী বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেলেন। মাওয়ালী যোদ্ধাগণ বর্শা-তীর-চালনায় পুরুষানুক্রমে ওস্তাদ্; তাহারা শিবাজীর অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণে অপূর্ব্ব দক্ষতা দেখিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট্ করিল। মাওয়ালী সর্দ্দারের ছেলেরা আসিয়া শিবাজীকে ওস্তাদ্ স্বীকার করিল। অনুকূল ক্ষেত্র পাইলেই বীজ অঙ্কুরিত হয়, অঙ্কুর হইতে শিশুবৃক্ষ উদ্গত হইয়া উঠে। দাদাজী কণ্‌দেও সাহেবের নিকট নিজের দেশের পরাধীনতার ইতিহাস শুনিয়া বালকের প্রাণের এক নিভৃত কোণে এক টুক্‌রা রঙ্গীন কল্পনার মেঘ ধীরে ধীরে কায়া-পরিগ্রহ করিল। ছিঃ, পরাধীন দেশের মৃত্তিকায় আমার জন্ম! ইহাকে কি স্বাধীন করা যায় না?

প্রথমতঃ মাওয়ালী সর্দ্দারের ছেলেদের সহিত মিলিয়া তিনি দূর জঙ্গলে নেকড়ে, শূকর ও ভালুক শিকারে যাইতেন। কখনও কখনও চারি পাঁচদিনের রাস্তা ও গিরি-নদী পার হইয়া, তিনি সদলবলে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইয়া বেড়াইতেন। শেষে দুই একজন মাওয়ালী সর্দ্দার তাঁহার মাথায় লুণ্ঠনের ধারণা ঢুকাইয়া দিল।

তাঁহার দলে তখন উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির তাগড়া তাগড়া যুবকও আসিয়া যোগ দিতে লাগিল। ইহারা দুই চারি জায়গায় হিন্দু-মুসলমান বড় লোকের বাড়ীতে ডাকাতি করিয়া বহু ধনরত্ন লুণ্ঠিত করিল। কানাঘুষা হইল যে, শিবাজীই দলবল লইয়া এই কাজ করিয়াছে। দাদাজী ও জীজী শিবাজীকে আচ্ছা করিয়া ধমকাইয়া দিলেন। মাকে তিনি যথেষ্ট ভক্তি করিতেন; কিছুদিন বেশ শান্তশিষ্ট হইয়া রহিলেন।

অঙ্কুরিত বীজ মাটির অন্ধকারে বেশীদিন মুখ লুকাইয়া থাকিতে চাহে না, বিপুল পৃথিবীর আলোকের সমারোহে সে উন্নত মস্তকে বাহির হইয়া আসিতে চাহে। শিবাজীর বয়স তখন মাত্র ষোলো। যে সময়ে আমাদের দেশের ছেলেরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বইয়ের বোঝায় দিবারাত্র মুখ লুকাইয়া ডিগ্রী ও কেরাণীগিরির স্বপ্ন দেখে, সেই সময় শিবাজী গোপনে তাঁহার তিনজন শ্রেষ্ঠ মাওয়ালী বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া, তোর্ণা দুর্গ দখল করিতে সঙ্কল্প করিলেন। এই তিন বন্ধু পরবর্ত্তিকালে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। ইঁহাদের নাম যশজী কঙ্ক, তানাজী মালশ্রী ও বাজী ফসল্‌কার। ইঁহাদের সহায়তায়, নামমাত্র যুদ্ধ করিয়াই পুনার দশ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে তোর্ণার বিখ্যাত গিরিদুর্গ শিবাজী দখল করিয়া ফেলিলেন। মুঘল দুর্গ-রক্ষক তাঁহার সৈন্যদল লইয়া মানে মানে সরিয়া পড়িলেন।

বৃদ্ধ দাদাজী ক্ষণদেও শিবাজীকে ভৎর্সনা করিলেন এবং এই ঔদ্ধত্যের শাস্তি যে কী ভয়ঙ্কর হইবে, তাহাও সন্দেহে

বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু শিবাজী বুঝিয়াও বুঝিলেন না। তাঁহার নবজাগ্রত প্রাণে তখন অফুরন্ত উৎসাহ, সর্ব্ব অঙ্গে আত্ম-প্রসারের প্রদীপ্ত চাঞ্চল্য। তাঁহার সমস্ত সত্তাই যেন ধূর্জ্জটির মত্ততায় নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছে—

"ভাঙ্‌রে হৃদয় ভাঙ্‌রে বাঁধন,
সাধ্‌রে আজিকে প্রাণের সাধন;
লহরীর পর লহরী তুলিয়া
আঘাতের পর আঘাত কর্।
মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ,
কিসের আঁধার কিসের পাষাণ,
উথলি যখন উঠেছে বাসনা,
জগতে তখন কিসের ডর্!"...

তখন বিজাপুর-রাজ কর্ণাটের যুদ্ধব্যাপার লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত; তদুপরি নবপ্রাপ্ত রাজ্যখণ্ডসমূহে শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে অবিশ্রাম পরিশ্রম করিতে হইতেছিল। তাঁহারা বালক শিবাজীর এই দুঃসাহসিকতার দণ্ড দিতে বিশেষ ব্যগ্র হইলেন না। তবে একটা কৈফিয়ৎ চাওয়ার ফলে এই উত্তর পাইলেন যে, শিবাজী বিজাপুর-রাজেরই স্বার্থরক্ষার জন্য কিল্লাদারকে তাড়াইয়া দিয়াছেন এবং এই অঞ্চল হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী খাজনা আদায় করিয়া রাজ-সরকারে প্রেরণ করিবেন। কিন্তু ইহা একটা ফাঁকিবাজী চাল মাত্র।

ইতোমধ্যে মহা উৎসাহে বিজিত তোর্ণাদুর্গের সংস্কার-সাধন

চলিতে লাগিল। একদিন নূতন প্রাকারের ভিত্তি খুঁড়িতে খুঁড়িতে শিবাজীর লোকজন কয়েক থান্ সোনা পাইল। সেই দৈবলব্ধ স্বর্ণই তাঁহার ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা-সমরের প্রথম মূলধন হইল। এই স্বর্ণদ্বারা দুর্গ-মধ্যে ভবানী দেবীর এক মন্দির নির্ম্মিত হইল এবং বহুতর অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করা হইল। বাকী অর্থে তোর্ণার দেড় ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে মোরাবাদ পর্ব্বতের উপর এক প্রকাণ্ড অজেয় দুর্গ তৈয়ারী করা হইল। উহার নাম হইল রায়গড়।

শাহ্জী ভোঁস্‌লে তখন সুদূর কর্ণাটে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত। পুত্রের এই রাজদ্রোহকর আচরণে তিনি বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন; তথা হইতে রীতিমত এক কড়া চিঠি তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন। অভিভাবক দাদাজী কণ্ডদেবও শাহ্জীর একখানা ভর্ৎসনাপূর্ণ পত্র পাইলেন। একদিকে শিবাজীর—অন্যদিকে শাহ্জীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দাদাজী মিয়মান্ হইয়া পড়িলেন। ক্রমশঃ তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া তিনি শিবাজীকে রায়গড় হইতে ডাকাইয়া আনিলেন। মা ভবানী তাঁহার এই কিশোর শিষ্যকে দিয়া জাতির স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিতেছেন, দাদাজী তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। "গো-ব্রাহ্মণ-কৃষককুলের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দাও, হিন্দু জাতিকে তাহার স্বপ্নমুগ্ধ জড়িমার মধ্য হইতে জাগ্রত মহিমার আলোকে টানিয়া আন, মা ভবানীর শ্রীচরণ ভরসা করিয়া অসি হস্তে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও"—এমনি আশীর্ব্বাদ করিয়া,

শিবাজীর বাল্যগুরু ও প্রিয় অভিভাবক দাদাজী কোণ্ডদেব দেহত্যাগ করিলেন (১৬৪৭ খৃঃ অঃ)।

দাদাজীর মৃত্যুর পর, শিবাজী সমস্ত পৈত্রিক জায়গীরের ভার নিজের হাতে গ্রহণ করিলেন।

দশম অধ্যায়

শিবাজীর স্বাধীনতা-সংগ্রাম

জায়গীরের এলাকা-মধ্যে দুইজন বিজাপুর সরকারের বিশ্বস্ত হিন্দু কর্ম্মচারী ছিলেন; ইহাদিগকে দলে না আনিলে অথবা তাড়াইয়া দিতে না পারিলে, শিবাজীর প্রতাপ অক্ষুণ্ণ থাকিবে না, ইহা বেশ স্পষ্ট বুঝা গেল। এই দুইজন ব্যক্তির একজন ছিলেন চাকন দুর্গের অধ্যক্ষ—ফিরঙ্গজী নার্সালা; অন্যজন শিবাজীর সৎমামা, সোপা পরগণার মুকদ্দার—বাজী মোহিতে। কুড়ি বৎসর বয়স্ক শিবাজীর উদ্দীপনাময় বক্তৃতা ও তাঁহার অসমসাহসিক কার্য্যকলাপে মুগ্ধ হইয়া, নার্সালা বিজাপুর সরকারের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া, তাঁহার দলে আসিয়া যোগ

দিলেন। শিবাজী পূর্ব্বের মতই তাঁহাকে চাকুন্ দুর্গের কেল্লাদা-রিতে বাহাল রাখিলেন এবং উহার চতুর্দ্দিকের গ্রামসমূহের তহ্শীলদার করিয়া দিলেন।

ইহার পর একদিন শিবাজীর দলবল কোন্দনা-দুর্গ অধিকার করিতে চলিল। মুসলমান কেল্লাদার যুদ্ধ না করিয়া, একটা মোটা রকমের ইনাম চাহিলেন। বিনা রক্তপাতেই কোন্দনা অধিকৃত হইল। মোটা রকমের বক্শীশ্ পাইয়া, কেল্লাদার তাঁহার লোক-লস্কর, অস্ত্র ও রশদ্ মাওয়ালী সেনানায়কদের হাতে তুলিয়া দিয়া, হাসিমুখে চলিয়া গেলেন। শিবাজী এই দুর্গের নাম দিলেন 'সিংহগড়'।

বাজী মোহিতে কিন্তু এই উদ্ধত ভাগ্নে বাবাজীর নিকট মাথা নত করিতে চাহিলেন না। তখন তানাজীর নায়কত্বে একদল মাওয়ালী সৈন্য গভীর নিশাথে বাজী মোহিতের বাড়ী ও তাঁহার তিন শত বিজাপুরী ঘোড়্ সওয়ারকে আক্রমণ করিল। তাহাদের চক্ষু হইতে ঘুমের ঘোর কাটিতে না কাটিতেই তাহারা সকলে তানাজীর হস্তে বন্দী হইল। অবশেষে শিবাজী বাজী মোহিতে ও তাহার দলবলকে মুক্তি দিয়া, সে-দেশ ছাড়িয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন। মোহিতের কতক মারাঠী সৈন্য শিবা-জীর দলে চাকুরী লইল।

পুণা ও সোপা পরগণা শিবাজীর পুরাপুরি অধিকারে আসিল। বড়মাট্টি ও ইন্দাপুর তহশিল্ হইতেও রীতিমত খাজ্না আদায় হইতে লাগিল। সে অঞ্চলে শিবাজীর বিরুদ্ধে মাথা

তুলিবার স্পর্দ্ধা কাহারও ছিল না। বলা বাহুল্য, শিবাজী এক পয়সা খাজনাও রাজ-সরকারে প্রেরণ করিলেন না।

দাদাজীর মৃত্যুর কয়েক দিন পরেই বিখ্যাত পার্ব্বত্যদুর্গ পুরন্দরের কেল্লাদার নীলকণ্ঠ রাওয়ের মৃত্যু হয়। তখন দুর্গের কর্তৃত্ব লইয়া তাঁহার তিন ছেলের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়া উঠে। বড় ছেলে কেল্লাদারের পদ অধিকার করিয়া, অন্য দু'টি ভাইকে ছাঁটিয়া ফেলিবার মতলব করিয়াছিলেন। উহারা শিবাজীর শরণাপন্ন হইল। শিবাজী কয়েকজন অনুচর লইয়া মধ্যরাত্রে ভাই দুই-জনের সহিত পরামর্শ করিবার অছিলায়, পুরন্দর দুর্গে গোপনে প্রবেশ করিলেন। তাহাদেরই সাহায্যে নীলকণ্ঠের বড় ছেলেকে বন্দী করা হইল ও দুর্গের অধিকাংশ সৈন্যকে তাঁহার আয়ত্তে আনা হইল। কিন্তু নীলকণ্ঠের অন্য দুইটি ছেলের হাতে তিনি দুর্গের কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন না; কারণ একাধিপত্য লইয়া ইহাদের মধ্যেও অচিরে বিবাদ বাধিয়া উঠা স্বাভাবিক। সুতরাং পুরন্দর দুর্গের ভার শিবাজীর একজন বিশ্বস্ত অনুচরের হাতে দেওয়া হইল। ছেলে দুইটিকে তখনকার মত নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল। কিছুদিন পরে শিবাজী তিন ভাইকেই মুক্তি দিয়া, কয়েকখানি গ্রাম দান করিলেন।

বিনা রক্তপাতে অথবা সামান্য রক্তপাতেই শিবাজী তাঁহার পৈত্রিক জায়গীরের মধ্যে ও আশেপাশের অনেকগুলি দুর্গ হস্তগত করিয়া ফেলিলেন। দেখিতে দেখিতে অধিকাংশ মাওয়াল-ভূমি তাঁহার বাধ্য হইয়া পড়িল; ব্রাহ্মণ দেশমুখ ও দেশপাণ্ডে-

গণও এই যুবকের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের নিকট নমনীয় হইয়া পড়িলেন। বিজাপুর-সুলতানের নিকট এ সকল সংবাদ গেলে, তিনি মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু প্রকাশ্যে শিবাজীকে জব্দ করিবার উদ্যোগ করিলেন না এই কারণে যে, শাহজী কর্ণাট্ যুদ্ধে তাঁহার যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন ; তাঁহার পুত্রকে এসময় শাস্তি দেওয়াটা সুবিবেচনার কার্য্য হইবে না। কিন্তু পিতা ও পুত্র—দুইজনের নিকটই তীব্র ভৎসনাপূর্ণ পত্র প্রেরিত হইল।

সমস্ত কঙ্কনভূমিই তখন বিজাপুরের অধিকারে। উত্তর কঙ্কন লইয়া একটা সুবা গঠিত হইয়াছিল, ইহার নাম কল্যাণ। বর্ত্তমান্ কল্যাণ শহরের কয়েক ক্রোশ উত্তর হইতে পুণার বাইশ তেইশ ক্রোশ পশ্চিমে নাগথানা পর্য্যন্ত প্রকাণ্ড ভূভাগ তখন কল্যাণ সুবার অন্তর্গত। সে সময় মৌলানা আহমেদ্ কল্যাণের সুবাদার। তিনি সমগ্র সুবার মালগুজারি রাজধানী বিজাপুরে প্রেরণ করিতেছেন শুনিয়া, শিবাজী তাহা লুণ্ঠন করিতে মনস্থ করিলেন। তিন শত বর্গীর সৈন্য ও একদল মাওয়ালী পদাতিক লইয়া তিনি কল্যাণের খাজনা-রক্ষী সৈন্য দলের উপর ব্যাঘ্রবিক্রমে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। কতক প্রাণ দিল, কতক প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল ; সমস্ত অর্থই শিবাজীর হস্তগত হইল। লুণ্ঠিত ধন শিবাজীর সৈন্যদলে সমান ভাগে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল।

ক্রমাগত কৃতকার্য্যতায় শিবাজীর সাহস বাড়িয়া গেল।

শিবাজীর প্রায় সমবয়স্ক এক ব্রাহ্মণ যুবক দাদাজী কণ্ডদেবের অধীনে শিক্ষা পাইয়া শাহজীর জায়গীরে একটা লেখাপড়ার চাকুরী করিতেন। ইঁহার নাম আবাজী সন্দেও। তিনি শিবাজীর বেজায় ভক্ত ও মন্ত্রদাতা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার যেমন ছিল বক্তৃতা দ্বারা মন ভিজাইবার শক্তি, তেমনি ছিল ব্যবহারিক কূটবুদ্ধি; যুদ্ধ-বিদ্যায়ও তিনি অল্প দিনে বিস্ময়কর জ্ঞানলাভ করিলেন। তাঁহার পরামর্শে শিবাজী কাঙ্গুড়ী, টুঙ, তিকোণ, ভুরুপ, কোয়ারি, লোহগড়, রাজমাচি প্রভৃতি দুর্গ যৎসামান্য রক্তক্ষয়েই জয় করিতে পারিলেন। তদুপরি, যশজী, তানাজী ও বাজী কসলকার তাঁহাদের মাওয়ালী অনুচর লইয়া, সামান্য চেষ্টাতেই গোশালা, রাইড়ী, তালা প্রভৃতি পার্ব্বত্য দুর্গগুলি অধিকার করিয়া ফেলিলেন।

ইহার পর আবাজী সন্দেও মাওয়ালী ও মারাঠাদের মিশ্রিত একদল সৈন্য লইয়া, পশ্চিমঘাট পর্ব্বত পার হইয়া, কল্যাণ সুবায় আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ভীমড়ী নামক স্থানে সুবাদার মৌলানা আহ্‌মেদ্ তখন মালগুজারি-লুণ্ঠনের ক্ষত লইয়া বিষণ্ণ, কাতর। হঠাৎ তাঁহার প্রদেশ আক্রান্ত দেখিয়া, তিনি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। তাঁহার সৈন্যগণ ভালো করিয়া লড়িতে পারিল না। মৌলানা পরাজিত ও বন্দী হইলেন। শিবাজী এই সংবাদে আনন্দ-বিহ্বল হইয়া অনতিবিলম্বে কল্যাণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উৎসব-উল্লাসের মধ্যে আবাজী সন্দেও কল্যাণের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। রাজ্যের দক্ষিণ দিকে

দুইটি বড় বড় দুর্গ নির্ম্মিত হইল। সর্ব্বত্র প্রজার আয় বুঝিয়া খাজনা নির্দ্ধারণ ও আদায় করিবার ব্যবস্থা করা হইল। হিন্দু মন্দিরের জন্য বড় বড় ব্রহ্মত্র দান করা হইল। দেশের হিন্দু-মুসলমান্ মোকদ্দার, দেশমুখ ও জায়গীরদারগণ একে একে আসিয়া নূতন মনিবকে নজরাণা দিতে আরম্ভ করিলেন।

মৌলানা আহ্মেদ ও তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি শিবাজী কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই; বরং আশাতিরিক্ত ভদ্র ব্যবহার করিয়া, তাঁহাদিগকে প্রচুর পাথেয় দিয়া, রাজধানীর পথে রওনা করাইয়া দেন্। মৌলানা আহ্মেদের মুখে শিবাজীর প্রচণ্ড দৌরাত্ম্যের কথা শুনিয়া, মোহাম্মদ আদিল শাহ্ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। শাহ্জীর নিশ্চয়ই ইহাতে গোপন সম্মতি আছে, এই বিশ্বাসে সুলতান তাঁহাকে যথাযোগ্য শাস্তি দিবার সঙ্কল্প করিলেন। তখন শাহ্জী অস্থায়ীভাবে কর্ণাট সুবার শাসন-কর্ত্তার কার্য্য করিতেছিলেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে সুলতানকে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে, শিবাজীর এই সকল বিদ্রোহজনক ব্যবহারের জন্য তিনি বিন্দুমাত্র দায়ী নহেন; ইচ্ছা করিলে, সুলতান তাঁহার পুত্রকে দমন করিয়া যথাযোগ্য শাস্তি দিতে পারেন। এ কৈফিয়তে সুলতান্ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি বাজী ঘোড়্ফোড়েকে আদেশ পাঠাইয়া দিলেন—শাহ্জীকে কৌশলে বন্দী করিয়া বিজাপুরে পাঠাইবার জন্য। ঘোড়্ফোড়ে কর্ণাট-শাসনে শাহ্জীর সহকর্ম্মী ও বন্ধু ছিলেন। তিনি একদিন শাহ্জীকে নিজ বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া,

হঠাৎ বন্দী করিয়া ফেলিলেন এবং সকলের অলক্ষ্যে তাঁহাকে বিজাপুরে পাঠাইয়া দিলেন (১৬৪৯ খৃঃ অঃ)।

একটা অপ্রশস্ত পাথরের কুঠুরীর মধ্যে বিজাপুর-রাজের ওই মহাহিতৈষী ব্যক্তিটিকে বন্দী করিয়া রাখা হইল। সুলতানের হুকুমে শাহ্‌জী তাঁহার পুত্রের নিকট পত্র লিখিয়া, তাহার অধিকৃত সমুদায় ভূমি ও দুর্গাদি প্রত্যর্পণ ও তাঁহাকে আত্ম-সমর্পণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন; নচেৎ নির্দিষ্ট সময়-অন্তে সেই অন্ধকার কারাকক্ষে বিনা খাদ্য ও পানীয়ে তাঁহাকে মারিয়া ফেলা হইবে। শিবাজী এই পত্র পাইয়া মহাচিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

পুত্রের অপরাধে পিতার প্রাণদণ্ড হইবে, ইহা কল্পনায় আনিতেও তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। সইবাঈ বীরের পত্নী। সুলতানের নিকট তাঁহার স্বামী আত্ম-সমর্পণ করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন জানিয়া, তাঁহাকে বিনয়বচনে বুঝাইয়া বলিলেন, "পিতার বিপদে পুত্রের চঞ্চল হওয়া স্বাভাবিক; বিপদ হ'তে তাঁকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করাও পুত্রের কর্ত্তব্য। কিন্তু এতদিন শত শত প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে ও নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে' যে স্বাধীনতার বীজ রোপণ কর্লে, তা' কি এক নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে? পিতাকে বাঁচাবার কি আর অন্য উপায় নেই? অন্য কোন বৃহত্তর শক্তির সাহায্য নিয়ে বিজাপুর-রাজকে কি কাহিল করা যায় না?"

চমৎকার যুক্তি! এতদিন তিনি মুঘলদের কোন অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়া, তাহাদিগকে অসন্তুষ্ট করেন নাই। বরং জুন্নার

ও আহ্‌মেদনগর জেলায় তাঁহাদের যে বিস্তৃত জমিদারী ছিল গত কয়েক বৎসর কাল তাহার কোন উপসত্বই মুঘল শাসন-কর্ত্তাদের নিকট দাবী করেন নাই। তিনি তখনই সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের নিকট সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া লিখিয়া, তাঁহার পিতার প্রাণরক্ষায় সহায়তা করিতে এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করিলেন; ঐ সঙ্গে তিনি যে সম্রাটের সেবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত—তাহাও জানাইয়া দিলেন।

মুঘল-সম্রাট্ শাহ্‌জীর অতীত কার্য্যের জন্য তাঁহার প্রতি খুব প্রসন্ন ছিলেন না। তথাপি শিবাজীর মত একজন বীর মারাঠী যদি তাঁহার অনুগত থাকে, তাহা হইলে দাক্ষিণাত্যে পাঠান বা হিন্দু রাজাদের ভবিষ্যৎ অবাধ্যতাকে তাঁহারা সহজেই দমন করিতে পারিবেন—এই ভাবিয়া শাহ্‌জাহান্ বিজাপুর-সুলতানকে শাহ্‌জীর মুক্তির অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। মোহাম্মদ আদিল শাহ শাহ্‌জীকে মুক্তি দিলেন বটে; কিন্তু মন্ত্রী মোরার পন্থ তাঁহার জামীন্ রহিলেন। ইহার পর তিন বৎসর কাল বৃদ্ধ শাহ্‌জী এক প্রকার নজরবন্দী অবস্থায়ই রাজধানীতে অবস্থান করেন।

অবশেষে কর্ণাটের চতুর্দ্দিকে ভীষণ বিদ্রোহ দেখা দিল। বিজাপুর-সুলতান শাহ্‌জীর কল্পিত অপরাধ ক্ষমা করিয়া, তাঁহাকে বিদ্রোহ-দমনে প্রেরণ করিলেন। কর্ণাটে কণিকাগিরির জেল্লা-দারের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভূজী নিহত হন্। প্রায় বৎসরাধিক কাল ধরিয়া বহু কষ্ট স্বীকারের পর

কর্ণাটের অধিকাংশ জায়গায় কথঞ্চিৎ শান্তি ফিরিয়া আসে। কিন্তু ইহার পর শাহজীর শরীর ক্রমশঃ ভাঙিয়া পড়ে। একে শম্ভুজীর অকাল মৃত্যু, অন্যদিকে শিবাজীর বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা— তাঁহার দেহ মনকে একেবারে পঙ্গু করিয়া ফেলে। সেই পঙ্গু দেহ লইয়াই তিনি মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত (জানুয়ারী ১৬৬৪ খৃঃ অঃ) বিজাপুর-রাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পূর্বে তিনি একবার তাঁহার মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানকে দেখিতে পুনায় আসিয়াছিলেন।

পিতার কর্ণাট-যাত্রার পূর্ব পর্য্যন্ত শিবাজী এক প্রকার নিষ্ক্রিয় হইয়াই ছিলেন। তারপর তাঁহার বিজয়-লিপ্সা আবার পূর্ণোদ্যমে জাগিয়া উঠিল। জাওলীর রাজা চন্দ্ররাও মোরে বিজাপুরের এক প্রতাপশালী সামন্ত; কল্যাণ সুবার পরেই তাঁহার জমিদারী উল্লেখযোগ্য। শিবাজী ইঁহাকে দলে টানিবার জন্য বিবিধ চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারিলেন না। বরং তিনি তলে তলে শিবাজীর প্রাণনাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিকারের কাছে এত বড় একজন ক্ষমতাশালী শত্রুকে বজায় রাখা নিরাপদ নহে। সুতরাং ইঁহাকে দমন করা আবশ্যক।

বল যেখানে ব্যর্থ, কৌশল সেখানে চমৎকার কার্য্যসাধক। চন্দ্ররাওয়ের এক বিবাহযোগ্যা সুন্দরী কন্যা ছিল। শিবাজীর জন্য সেই কন্যাকে দেখিতে ও বিবাহের কথাবার্ত্তা চালাইতে, পঁচিশ জন ভদ্রবেশী মাওয়ালী যোদ্ধা সাথে করিয়া ব্রাহ্মণ রঘুজী বল্লাল ও মারাঠা-সর্দার শম্ভুজী কাওয়াজী প্রেরিত হইলেন।

বলা বাহুল্য, বিবাহের প্রস্তাব একটা প্রকাণ্ড ভণ্ডামি মাত্র। জাওলীর পথ-ঘাট ও অন্ধিসন্ধি জানিয়া লওয়াই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। কিছুদিন পরে বল্লাল ও কাওয়াজী খবর পাঠাইলেন যে, জাওলীর দুই একটি স্থান ছাড়া সমস্ত ঘাট ঘাট সৈন্যদল দ্বারা সর্ব্বদা সুরক্ষিত; এমতাবস্থায় চন্দ্ররাওকে হত্যা করা ছাড়া আর উপায় নাই।

শিবাজী উত্তরে জানাইলেন, হত্যা অপেক্ষা কৌশলে বন্দী করাই অধিকতর বাঞ্ছনীয়; তিনি সৈন্য লইয়া, অনতিদূরেই প্রস্তুত থাকিবেন। অবিলম্বে তিনি রায়গড় হইতে পুরন্দর আসিলেন এবং দুই স্থান হইতে এক এক বিরাট বাহিনী গঠন করিয়া রাতারাতি মহাবালেশ্বর পর্ব্বতের উদ্দেশ্যে পাঠাইয়া দিলেন। গুপ্তচরের সন্দেহ এড়াইবার জন্য তিনি সামান্য কয়জন অনুচর লইয়া সম্পূর্ণ উল্টা পথে জাওলীর দিকে ঘোড়ায় চড়িয়া চলিলেন। মহাবালেশ্বর অতি দুর্গম জনশূন্য স্থান, শ্বাপদসঙ্কুল গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ; ঐস্থান হইতেই কৃষ্ণা নদীর উৎপত্তি। শিবাজীর সৈন্যগণ এইখানে আসিয়া লুকাইয়া রহিল। শিবাজীও ভিন্ন পথ দিয়া আসিয়া তাহাদের সহিত যোগ দিলেন।

গভীর রজনী। রঘুজী ও শম্ভুজী, সেই সময় চন্দ্ররাও ও তাঁহার ভ্রাতার সহিত একটা জরুরী কার্য্যের জন্য সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন। প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে পঁচিশজন মাওয়ালী যোদ্ধা উন্মুক্ত তরবারী হস্তে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিল। উৎসাহের আতিশয্যে রাজা ও রাজভ্রাতাকে খুন করিয়া,

সেই রাত্রে রঘুজী ও শম্ভুজী মহাবালেশ্বরের দিকে পলায়ন করিলেন।

ভোর বেলায় রাজার শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদে প্রাসাদের ভিতরে-বাহিরে ক্রন্দন ও ক্রোধের একটা কুরুক্ষেত্র লাগিয়া গেল। ওদিকে শিবাজী তাঁহার সৈন্যবাহিনী লইয়া একযোগে জাওলীর তিনটি ঘাঁটি অবরোধ করিয়া বসিলেন। চন্দ্ররাওয়ের দুই পুত্র ও রাজ্যের মন্ত্রী হিম্মৎরাও প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হিম্মৎরাওয়ের পতনের সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীরও পতন হইল। ওদিকে বাশোটা ও শিউতার-খোরার দুর্গও শিবাজীর পদে প্রণত হইল। রোহিরা জেলার দেশমুখ 'বান্দলা' ও দেশপাণ্ডে 'বাজী পর্ভু' মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া শিবাজীকে প্রাণপণে বাঁধা দিয়াছিলেন। শেষে যুদ্ধ করিতে করিতে বান্দলার মৃত্যু হয়। বাজী পর্ভু সদলে শিবাজীর অধীনতা স্বীকার করিলেন। জাওলী-বিজয় সম্পূর্ণ হইয়া গেল। মহাবালেশ্বরের এক উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গে শিবাজীর প্রতাপ চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য অজস্র অর্থব্যয়ে প্রতাপগড় দুর্গ নির্ম্মিত হইল।

খৃষ্টীয় ১৬৩৭ সালের প্রথমে কিছুদিনের জন্য শাহ্‌জাহানের তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজীব দাক্ষিণাত্যের মোগল অধিকার-সমূহের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত ছিলেন। পুনরায় তিনি ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে ঐ পদে বাহাল হইয়া আসিলেন। এবার গোলকুণ্ডার এক বিচক্ষণ ও কূটকৌশলী মন্ত্রী—মীর্ জুম্‌লা তাহার দলে আসিয়া

তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া উঠিলেন। দুইজনে মিলিয়া, গোল-কুণ্ডা ও বিজাপুরকে কি উপায়ে খাশ্ দখলে আনা যায়, তাহারই পরামর্শ আঁটিতেন। কিছুদিন পরে মীরজুমলা আগ্রায় গিয়া সাম্রাজ্যের উজীর পদে বাহাল হইলেন। তিনি সম্রাট শাহজাহান-কেও দাক্ষিণাত্য-বিজয়ে ঘন-ঘন মন্ত্রণা দিতে লাগিলেন।

কিন্তু একটা অছিলা ত চাই। কপালক্রমে তাহাও জুটিয়া গেল। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে মোহম্মদ আদিল শাহ্ দীর্ঘকাল রোগে ভুগিয়া কবরে গিয়া শুইলেন। তাঁহার আঠারো বৎসর বয়স্ক পুত্র 'দ্বিতীয় আলি আদিল শাহ্' নাম লইয়া মহা আড়ম্বরে বিজাপুরের সিংহাসনে বসিলেন। মোহাম্মদ আদিল শাহ্‌র বিধবা পত্নী অভিভাবিকা স্বরূপ রাজকার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিতে লাগিলেন। পেশ্‌ওয়ে খোরে পন্থও কিছুদিন পরে মারা গেলে, তাঁহার স্থলে খান্ মোহাম্মদকে প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি-পদে নিযুক্ত করা হইল। আফ্‌জাল্ খাঁ কর্ণাটের বিদ্রোহ দমনে যথেষ্ট বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন বলিয়া সহকারী প্রধান সেনাপতি হইলেন। তাঁহার নীচেই স্থান পাইলেন দুষ্টমতি ঘোড়্‌ফোড়ে।

কিন্তু আগ্রা হইতে সম্রাটের এক ফার্ম্মাণ্ আসিল যে, যেহেতু দ্বিতীয় আলি আদিল্ শাহ্ ভূতপূর্ব্ব সুলতানের বিবাহিত পত্নীর গর্ভজাত পুত্র কিনা তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, এবং যেহেতু রাজ্যাভিষেকের সময় সমস্ত বাকী খাজ্‌না ও নামসত্তি-নজরাণা মুঘল সরকারে জমা দেওয়া হয় নাই, সেইজন্য দ্বিতীয় আদিল শাহ্‌র সুলতানি বাতিল করিয়া দেওয়া

হইল ; সম্রাটের প্রতিনিধি শীঘ্রই বিজাপুরে গিয়া নূতন সুলতান নির্ব্বাচন করিবেন।...

বিজাপুর-দরবারের সকলেই বুঝিতে পারিল যে, বিজাপুর গ্রাস করিবার ইহা একটা ওজর মাত্র। অমনি মুঘল বাহিনীকে বাধা দিবার জন্য 'সাজ সাজ' রব পড়িয়া গেল। অচিরে মীরজুম্‌লা ও ঔরঙ্গজেব অগণন অশ্বারোহী ও পদাতিক লইয়া ক্ষীরকীর (এই সময় 'ঔরঙ্গাবাদে' পরিণত) পথ দিয়া, বিজাপুর-সীমান্তে কল্যাণী নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নগর-দুর্গ তখনই বিজিত হইল। তারপর বিদরের কেল্লাও আক্রান্ত হইল। হঠাৎ কেল্লার বারুদখানায় আগুণ লাগায় প্রায় সমস্ত বিজাপুরী সৈন্য পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। ঔরঙ্গজেবের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি বিশ্রাম বিসর্জ্জন দিয়া, গুলবর্গা হইতে অনবরত বিজাপুর-রাজধানীর অভিমুখে আগাইয়া চলিলেন।

মধ্যপথে খাঁন্ মোহাম্মদ্ তাঁহাদের বাধা দিতে দণ্ডায়মান্ হইলেন ; কিন্তু সুচতুর মীরজুম্‌লা তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দিয়া নিষ্ক্রিয় রাখিলেন। রাজধানী বিজাপুর অল্প চেষ্টায়ই মুঘলদের হাতে আসিল (১৬৫৭ খৃঃ অঃ)। নবীন সুলতান্ ও তাঁহার মাতা সন্ধির প্রস্তাব করিয়া খেসারৎস্বরূপ এক কোটী টাকা দিতে চাহিলেন্। কিন্তু ঔরঙ্গজীবের একান্ত ইচ্ছা—বিজাপুরকে খাশ্ করা। এমন সময় আগ্রা হইতে শাহ্‌জাহানের বাত ব্যাধিতে শয্যাশায়ী হওয়ার খবর আসিয়া পৌঁছিল। ঔরঙ্গজীব তখনকার মত বিজাপুরের সন্ধির প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া এক কোটি টাকা

হস্তগত করিলেন এবং সৈন্যদল সহ তাড়াতাড়ি আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহার পরে কি ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাস-পাঠকের অজানা নাই। যাহা হউক, বিজাপুর মুঘলের করাল গ্রাস হইতে আপাততঃ রক্ষা পাইল। কিন্তু ঘরের কানাচে আর এক শত্রু দিন দিন রাহুর মত বাড়িয়া, মুখ-ব্যাদান করিতে লাগিল।

ঔরঙ্গজেব বিজাপুর আক্রমণ করিতে আসিতেছেন শুনিয়াই শিবাজী তাঁহার নিকট পত্র লিখিয়া সম্রাটের প্রতি তাঁহার আনুগত্য নূতন করিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং দাবুল্‌ ও সমুদ্র-তীরবর্তী স্থানসমূহ মুঘলদের তরফ্‌ হইয়া জয় করিয়া দিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজীব তাঁহাকে সে অনুমতি দিয়াছিলেন এবং বিজাপুর-জয়ের নিমিত্ত তাঁহার সহিত মিলিত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনুমতির সুবিধা-টাই লইয়াছিলেন, অনুরোধের মর্য্যাদাটা রক্ষা করেন নাই। বিজাপুরের পাঠান, দিল্লীর মুঘল—দুই-ই মহারাষ্ট্রের শত্রু। দুইয়ের উচ্ছেদ-সাধনই তাঁহার জীবনের ব্রত।

ওদিকে বিজাপুরে-ঔরঙ্গজেবে যুদ্ধ লাগিয়াছে, এধারে শিবাজী নিজের কাজ গুছাইতে লাগিলেন। জুন্নার তখন মুঘল অধিকারে সমৃদ্ধিশালী শহর, তাহার দুর্গও তখন অত্যন্ত শক্তিশালী। জুন্নার আক্রমণ করিয়া তিনি তিন লক্ষ মোহর, দুই শত আরবী অশ্ব ও বহু মূল্যবান পোষাক্‌-আশাক্‌ লুণ্ঠন করিলেন। ভূতপূর্ব্ব রাজধানী আহ্‌মেদনগর আক্রমণ করিয়াও তিনি সাত শত ঘোড়া ও চারিটি হস্তী হস্তগত করিলেন। অতঃপর তিনি নূতন সৈন্যসংগ্রহে মন দিলেন।

শিবাজীর দলে এই সময় বহু মারাঠী শিলীদার আসিয়া যোগ দিল। তাহা ছাড়া লুণ্ঠিত কয়েক সহস্র অশ্ব দিয়া তিনি বর্গীর সৈন্যও তৈয়ার করিলেন। বিজাপুর সুলতানের জবাব পাইয়া, সাত শত পাঠান পদাতিক আসিয়াও তাঁহার চাকুরী গ্রহণ করিল। রাজা চন্দ্ররাওয়ের হত্যাকারী রঘু বল্লাল এই পাঠান দলের হাবিলদার হইলেন।

উত্তর কঙ্কন ত শিবাজীর অধিকারে পূর্ব্বেই আসিয়াছে। এইবার মুঘল বাদশাহের অনুমতির বলে বলীয়ান্ হইয়া তিনি দক্ষিণ কঙ্কন-জয়ে মনোযোগ দিলেন। সমুদ্র তীরবর্ত্তী কয়েকটি জায়গা তিনি আগেই হস্তগত করিয়াছিলেন; অনেকগুলি বড় বড় নৌকা গঠন করাইয়া, পর্ত্তুগীজদের অনুকরণে একদল জলদস্যুও বাহিনী করিয়া রাখিয়াছিলেন। দক্ষিণ কঙ্কনের তীরে তীরে তাহারা নির্ভয়ে লুটপাট করিয়া বেড়াইতে লাগিল। শ্যামরাজ পন্থ কিছুদিন পূর্ব্বে শিবাজীর প্রধান মন্ত্রী বা পেশ্‌ওয়া পদে বাহাল হইয়াছিলেন। একজন পাকা সেনাপতি বলিয়া তাঁহার একটু গর্ব্ব ছিল। তাঁহার অধীনে দক্ষিণ কঙ্কনে একদল মারাঠী সৈন্য প্রেরিত হইল। সেখানকার সুবাদার ফত্তে খাঁ শিদ্দী বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। শ্যামরাজ পন্থ যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইতে লাগিলেন; তাঁহার সৈন্য-চালনার দোষে শিবাজীর বহু সৈন্য হতাহত হইল। এমন সময় বর্ষা নামিয়া পড়ায় উভয় দলের সৈন্যই যুদ্ধ থামাইয়া দিল।

শিবাজী শ্যামরাজ পন্থের উপর ভীষণ বিরক্ত হইলেন।

তাঁহার সেনাপতি পদ ও গেলই, পরন্তু পেশ্‌ওয়ার পদও কাড়িয়া লওয়া হইল। প্রতাপগড়্‌ দুর্গের কেল্লাদার মোরো ত্রিম্বক্‌ পিঙ্গ্‌লেকে পেশ্‌ওয়া নিযুক্ত করা হইল এবং বর্ষার শেষে তাঁহাকে ও নেতাজী ফল্‌কারকে সেনাপতি করিয়া দক্ষিণ কঙ্কনে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। যথেষ্ট বেগ পাইয়া, তাঁহারা দক্ষিণ কঙ্কনের কোন কোন দুর্গ জয় করিলেন বটে, কিন্তু ফতে খাঁকে একেবারে কাবু করিতে পারিলেন না।...

এদিকে দিন-দুপুরে অলস বিজাপুরের ঘুম ভাঙ্গিল। সুলতান্‌-জননীর ক্রমাগত উত্তেজনাপূর্ণ বাণী শুনিয়া, দাম্ভিক সেনাপতি আফ্‌জাল খাঁ শিবাজীকে বশ করিতে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অধীনে রহিল পাঁচ হাজার অশ্বারোহী, সাত হাজার পদাতিক ও কয়েকটি দেশী কামান ও গোলন্দাজ। আফ্‌জল খাঁ পন্দরপুর পর্যান্ত অগ্রসর হইয়াছেন শুনিয়া শিবাজী প্রতাপগড়্‌ দুর্গে গিয়া আশ্রয় লইলেন। আফ্‌জলের অধীন মুসলমান্‌ সৈন্যগণ পন্দর-পুরের মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিল ও মারাঠা বণিকদের ধনরত্ন দুই হস্তে লুটপাট করিতে লাগিল। নিরীহ গ্রামবাসীদের স্ত্রীকন্যাদের উপরও অকথ্য অত্যাচার চলিতে লাগিল।

অবশেষে প্রতাপগড় হইতে কয়েক ক্রোশ পূর্ব্বে কৃষ্ণা নদীর তীরে বাঈ নামক স্থানে আসিয়া আফ্‌জাল শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এখন কৌশল ছাড়া আর উপায় নাই। শিবাজী আফ্‌জালের বশ্যতা স্বীকার করিয়া এক পত্র লিখিলেন এবং তাঁহার

ক্ষমার আশ্বাস পাইলে, হুজুরে হাজির হইয়া সমস্ত বিষয় নিবেদন করিবেন—জানাইলেন। সুচতুর আফজাল শিবাজীর চাতুরী বুঝিতে পারিলেন। তিনিও প্রকাশ্য যুদ্ধের অনিশ্চয়তার মধ্যে না গিয়া কৌশলে এই মারাঠা বীরকে বন্দী বা হত্যা করিতে চাহিলেন। তিনি শিবাজীকে এক পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, শিবাজী তাঁহার পুত্র সদৃশ স্নেহ-ভাজন। তিনি তাঁহার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছেন। বিজাপুর সুলতানও যাহাতে তাঁহাকে মাফ্ করেন, তাহার উপায় তিনি করিবেন। আপোষে কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য অমুক দিন অমুক সময় শিবাজী যেন একাকী নিরস্ত্রভাবে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনিও তাঁহার তাবুতে একাকী থাকিবেন, তবে প্রত্যেকের সঙ্গে এক একজন অনুচর থাকিতে পারে।

শিবাজী বুঝিলেন—এ শেয়ানে-শেয়ানে কোলাকুলি। তিনি সমস্ত দলবল নিকটবর্ত্তী অরণ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে মাতার পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া তিনি আফজালের সহিত দেখা করিতে প্রতাপগড় দুর্গের নীচে নামিয়া আসিলেন; সঙ্গে তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু তানাজী মালশ্রী। আফজাল পূর্ব্ব হইতেই মসলিনের চোগার নীচে একখানা ছোট তলোয়ার লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন; বিজাপুরী সৈন্যগণও অদূরে গা-ঢাকা দিয়া তাঁহার সঙ্কেতধ্বনির প্রতীক্ষায় ছিল। বিশ্বাসঘাতকার আশঙ্কায় শিবাজীও সর্ব্ব অঙ্গ লৌহবর্ম্মে আবৃত করিয়াছিলেন; কোমরে 'বিছু' নামক বাঁকানো ছুরী একখানা লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন

এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে দুইটি আংটির মাথায় বাঘনখের মত ছুঁচ ছুঁচালো অস্ত্র লাগাইয়া লইয়াছিলেন।

শিবাজীকে দেখিবামাত্রই বিরাটকায় বিজাপুরী সেনাপতি কুরহস্তে দুই বাহু মেলিয়া আলিঙ্গন করিতে আসিলেন। আলিঙ্গনের সময় আফ্‌জাল তাঁহার গলদেশ এক বাহু দ্বারা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া, অন্য হাতখানি চোগার নীচে চালাইয়া দিতেই, শিবাজী তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন। তিনি ক্ষিপ্রগতিতে আফ্‌জালের উদর-মধ্যে বাঘনখ পুরিয়া দিবামাত্র, আফ্‌জাল তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া তরবারি বাহির করিলেন। শিবাজীও তাঁহার 'বিছু' বাহির করিলেন। আফ্‌জালের তরবারি শিবাজীর দক্ষিণ বাহুতে ব্যর্থ আঘাত করিল, শিবাজী ছুটিয়া গিয়া তাঁহার বুকে আমূল ছুরিকা বসাইয়া দিলেন। শিবাজীর অনুচরেরা ছুটিয়া আসিয়া আফ্‌জালের মাথাটি কাটিয়া লইল। নিমেষের মধ্যে একটা বীভৎস কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

তারপর দুই পক্ষই জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া যুদ্ধ করিতে সুরু করিয়া দিল। দুই পক্ষই মরিয়া হইয়া যুদ্ধ করিল। নেতাজী ফল্‌কার যেন রণচণ্ডী-মূর্ত্তিতে চতুর্দ্দিকে মৃত্যুর বিভীষিকা ছড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে বিজাপুরী সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। শত্রুপক্ষের চারি হাজার অশ্ব, কয়েক শত উট, কয়েকটি হস্তী ও কয়েক বস্তা মোহর শিবাজীর জয়ের পুরস্কার স্বরূপ যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া রহিল।

এই অপ্রত্যাশিত জয়ের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, শিবাজী

কৃষ্ণা নদীর উত্তর পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগণা ও দুর্গ দখল করিতে লাগিয়া গেলেন। পানাল্লা ও পবনগড় সহজেই তাঁহার হাতে আসিল; বসন্তগড়ও তিনি অপূর্ব্ব ক্ষিপ্রতায় দখল করিয়া লইলেন। তারপর রঙ্গনা ও কালনার বিখ্যাত দুর্গ দুইটি কয়েক দিন যুদ্ধের পর জয় করিলেন। শিবাজী কালনার দুর্গটির নূতন নাম রাখেন বিশালগড়।

মিরাজ জেলার ফৌজ্‌দার রোস্তাম্‌ জমান্‌ শিবাজীকে বাধা দিতে পানাল্লার দিকে অগ্রসর হইলেন। শিবাজী তাঁহার সৈন্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, এমন মুষ্টিযোগ ঝাড়িলেন যে, খাঁ জমান্‌ তাঁহার জান্‌ লইয়া পলায়নপর হইলেন। শিবাজীর অশ্বারোহী সৈন্যদল তাঁহাকে ক্রোশের পর ক্রোশ তাড়া করিয়া লইয়া চলিল। সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় গঞ্জে ও থানায় লুণ্ঠন ও খাজ্‌না আদায় কার্য্যও চলিতে লাগিল। অবশেষে বিজাপুর রাজধানীর কয়েক ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া, তাহারা ফিরিয়া আসিল।

রাজধানী বিজাপুরের কানের কাছে শিবাজীর এই বিজয়-বিষাণ শুনিয়া সমগ্র রাজসভা চমকিত হইয়া উঠিল। এই কাল সাপের বিষদাঁত অচিরে ভাঙ্গিতে না পারিলে, কোন্‌ দিন সে সুলতানের মুকুটে ছোবল্‌ মারিবে।···শিবাজী তখন পানাল্লা দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন। সহসা সৈয়দ সালাবৎ খাঁর নেতৃত্বে একদল বিজাপুরী সৈন্য গিয়া দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিল। সেই সময় আফ্‌জলের যুবক পুত্র ফজল্‌ খাঁ আবার

নূতন একদল সৈন্য লইয়া আসিলেন। কামানের গোলায় দুর্গের দেওয়াল খসিয়া পড়িতে লাগিল, মারাঠা সৈন্যরা বন্দুকের ক্ষীণ আওয়াজে উহাদের বজ্র-নিনাদ স্তব্ধ করিতে পারিল না।

শিবাজীর বেশীর ভাগ সৈন্য তখন সুদূর দক্ষিণ কঙ্কনে; কতক সৈন্য রঙ্গনায় ও বিশালগড়ে। এবার তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু অবশেষে তাঁহার মাথায় একটা ফন্দী আসিল। সন্ধির প্রার্থনা জানাইয়া তিনি সন্ধ্যার সময় যুদ্ধ থামাইয়া দিলেন; সালাবৎ ও ফজল্ খাঁকে জানানো হইল যে, পরদিন সকালেই তিনি তাঁহার সৈন্যদল সমেত আত্মসমর্পণ করিবেন। বিজাপুরী পক্ষ নিশ্চিন্ত হইল, সৈন্যগণ স্ফূর্ত্তি করিয়া বহুদিন পরে অঘোরে নিদ্রা গেল। মধ্য রাত্রে শিবাজী তাঁহার আড়াই হাজার সৈন্য লইয়া দুর্গ হইতে পলায়ন করিলেন (সেপ্টেম্বর, ১৬৬০ খৃঃ অঃ)।

পরদিন ভোরে ব্যাপারটা জানা গেল। তখনই বিজাপুরী সৈন্যদল উর্দ্ধশ্বাসে চতুর মারাঠা-নায়কের অনুধাবন করিল। শিবাজী তখন বিশালগড়ের পথে। বিশালগড় হইতে আট মাইল দূরে গজপুরের সঙ্কীর্ণ গিরি-সঙ্কটে, রোহিরের ভূতপূর্ব্ব দেশপাণ্ডে কায়স্থ জাতীয় বাজী পর্ভু এক সহস্র সাহসী সৈন্য লইয়া বিরাট বিজাপুরী বাহিনীর পথ রোধ করিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন; বাকী দেড় হাজার লইয়া শিবাজী বিশালগড়ের দিকে দ্রুত কাওয়াজ করিলেন। প্রচণ্ড বিক্রমে সালাবৎ খাঁ বীর নেতা বাজী পর্ভুকে আক্রমণ করিলেন,

কিন্তু তাঁহার দলকে এক পদও হঠাইতে পারিলেন না। প্রভুভক্ত বাজী পভু' আপন সৈন্যদলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একাদিক্রমে নয় ঘন্টা কাল যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং সৈন্যদের উৎসাহ দিবার জন্য অনর্গল চীৎকার করিয়াছিলেন। শত শত মাওয়ালী সৈন্য এই যুদ্ধে প্রাণ দিল; শেষটা দেহের সর্ব্বাঙ্গে আহত হইয়া বাজী পভু'ও প্রাণ দিলেন। কিন্তু তিনি মৃত্যুর সময় শুনিয়া গেলেন যে, শিবাজী বিশালগড় দুর্গে নিরাপদে পৌঁছিয়াছেন। বাজী পভু'র অনাসাম্য বীরত্ব-গাথা মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে দিব্য জ্যোতিঃতে আজও ক্ষোদিত আছে, বুঝি অনন্ত কাল থাকিবে। গ্রীক্ থার্ম্মপলির যুদ্ধের সহিত গজপুরের গিরি-সঙ্কটের যুদ্ধও জগতের স্মৃতি-দেউলে চিরজাগ্রত হইয়া রহিয়াছে।

সালাবৎ খাঁ বিশালগড়ের দিকে অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না; তিনি মাঝ রাস্তায় তাঁবু ফেলিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে সন্দিগ্ধ সুলতান্ আলি আদিল্ নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া দেখা দিলেন। কোলাপুরের সন্নিকটে পানালা ও পবনগড় প্রথমেই তাঁহার হাতে আসিল। তাহা ছাড়া ঐ অঞ্চলের কয়েকটি ক্ষুদ্র দুর্গের অধ্যক্ষরা সুলতানের নিকট একে একে আত্ম-সমর্পণ করিল। ওয়ারী জেলার দেশমুখগণও তাঁহাকে সৈন্য ও অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু বর্ষার জন্য সুলতান কিছুকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন।

এদিকে শিবাজী কাল্না-দুর্গ হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই

দক্ষিণ কঙ্কনের বিখ্যাত বন্দর রাজাপুর দখল করিলেন। তার পর শৃঙ্গারপুরের অর্দ্ধস্বাধীন মারাঠা-সর্দার দুলেকে প্রকাশ্য যুদ্ধে হত্যা করিয়া, তাহার ক্ষুদ্র রাজ্যটি গ্রাস করিলেন। ইহাতে বহু হিন্দুর মনে আঘাত লাগিল। শিবাজীও অনুতপ্ত হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে জাওলী দখল করিতে গিয়াও বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বহু হিন্দুর প্রাণসংহার করিতে হইয়াছিল। অথচ হিন্দুর স্বাধীনতার জন্যই তাঁহার এই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ। এই সময় তিনি প্রতাপগড়ে ভবানীদেবীর এক প্রকাণ্ড মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া, মহাপুরুষ রামদাস স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

গুরু রামদাস নিজের গৈরিক বস্ত্র হইতে একটা টুক্‌রা ছিঁড়িয়া লইয়া, তাহাই শিবাজীর দীক্ষা-দণ্ডের উপর লাগাইয়া দেন। পরবর্ত্তিকালে শিবাজীর সমস্ত জয়-পতাকা গেরুয়া রঙে রঞ্জিত থাকিত। গুরু তাঁহার বীর শিষ্যকে 'স্বাধীন হিন্দু রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইবে' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। গুরু-দক্ষিণা স্বরূপ শিবাজী বিস্তৃত জায়গীর দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, রামদাস স্বামী প্রদীপ্ত চক্ষে বলেন, "বৎস, মহারাষ্ট্রের যে যে স্থান এখনও মুসলমান-কবলে আছে, তুমি সেইগুলি আমায় দান ক'রো।..."

বর্ষা-শেষে সুলতান যুদ্ধাভিযান্ পুনরায় আরম্ভ করিলেন। শিবাজীও রীতিমত প্রস্তুত ছিলেন। স্বজাতিদ্রোহী বাজী ঘোড়্‌ফোড়েও সুলতানের সঙ্গে ছিলেন। বিশালগড়ের

অনতিদূরেই মুধোলে ঘোড়্‌ফোড়ের প্রকাণ্ড জায়গীর। কয়েক-দিনের ছুটি লইয়া ঘোড়্‌ফোড়ে মুধোলে বেড়াইতে আসেন। সংবাদ পাইয়া, শিবাজী মুধোল আক্রমণ করিলেন। ঘোড়্‌-ফোড়ে ও তাঁহার পরিবারবর্গ নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইলেন; মুধোল পুড়াইয়া ছারখার করিয়া দেওয়া হইল। এতদিনে পিতৃ-অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ লওয়া হইল।

প্রায় দুই বৎসর কাল চেষ্টা করিয়াও সুলতান্ আলি আদিল্ শিবাজীর কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিলেন না। বিভিন্ন খণ্ড-যুদ্ধে তাঁহার যথেষ্ট সৈন্যক্ষয়ও হইল, রাজকোষও অর্থশূন্য হইল। তিনি বিরক্ত, অবসন্ন হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। অবশেষে উজীর আব্‌দুল মোহাম্মদ ও প্রভুভক্ত শাহ্‌জীর মধ্যস্থতায় সুলতান্ শিবাজীর সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন। শিবাজী স্বাধীন দেশনায়ক বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। প্রস্থে একশত মাইল ও লম্বে একশত যাট্ মাইল ব্যাপী ভূভাগ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা হইল। তাঁহার অধীনে তখন সাতহাজার অশ্বারোহী ও প্রায় পঞ্চাশ হাজার পদাতিক।

এতদিনে শিবাজীর বাল্য-স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইতে চলিল।···কিন্তু ছোট শত্রুর সহিত হিসাব নিকাশ হইল, এইবার বড় শত্রুর পালা!

——:০:——

একাদশ অধ্যায়

ছত্রপতি শিবাজী

ইতঃপূর্ব্বে ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধি থাকাকালে শিবাজীকে সমগ্র কঙ্কণ প্রদেশ অধিকার করিয়া ভোগ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ অথর্ব্ব সম্রাট্ শাহ্‌জাহানকে আগ্রা দুর্গে নজরবন্দী করিয়া, তিনি যখন নিজেই সিংহাসনে চড়িয়া বসিলেন, তখন সমগ্র দাক্ষিণাত্যকে অবিলম্বে তাঁহার পদতলে আনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। প্রথমেই তাঁহার সৈন্যদল আচম্বিতে আসিয়া কল্যাণ-ভীমণ্ডী অধিকার করিল। সুবাদার আবাজী সন্দেও অপ্রস্তুত ছিলেন। তিনি মুঘলদের নিবারণ করিতে পারিলেন না (১৬৬১ খৃঃ অঃ)।

কালবৈশাখীর দিন পশ্চিম আকাশের এককোণে হস্তমুষ্টির ন্যায় এক টুকরা কালো মেঘ কোথা হইতে আসিয়া বিনীতভাবে দেখা দেয়। খেয়ার মাঝি তাহাকে দেখিয়া হয়ত উপেক্ষার হাসি হাসে, বাতাসও তাহাকে দেখিয়া বোধহয় করুণা করে। তারপর যখন সে ধীরে ধীরে আত্মবিস্তার করিয়া, সমগ্র আকাশ ছাইয়া ফেলে, বিশ্বগ্রাসী সংহার মূর্ত্তিতে নটনাথের মত ভৈরব হুঙ্কার ছাড়ে, তখন মাঝ নদীতে আসিয়া ভয়ার্ত্ত মাঝি 'সামাল্ সামাল্' ডাক্ ছাড়ে, ভীম স্বননে প্রভঞ্জন আসিয়া তাহার সহিত বার্থ

সংগ্রাম করে। শিবাজীর এখন সেই অবস্থা! কোন রাজশক্তিরই ক্ষমতা নাই শিবাজীকে সহজে পরাস্ত করে। একটা-দুইটা পরাজয়ে তিনি দমিত হইবার পাত্র নহেন; বাহুতে তাঁহার অশেষ বল, হৃদয়ে তাঁহার অগাধ আত্ম-বিশ্বাস।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর-সুলতানের সহিত সন্ধি হইয়া যাইবার পরই তিনি মুঘলদিগের সহিত সরাসরি যুদ্ধে নামিলেন। মোরো পন্থ ঘোর বর্ষায় একদল মাওয়ালী লইয়া জুন্নারের উত্তরে মুঘল অধিকৃত কতকগুলি ঘাঁটি কাড়িয়া লইলেন। বর্ষার শেষে নেতাজী ফলকার একদল বর্গীর সৈন্য লইয়া জুন্নার হইতে আওরঙ্গবাদ জেলার প্রান্ত ভাগ পর্যান্ত প্রায় একশত মাইল স্থান লুণ্ঠন ও ধ্বংস করিয়া নিরাপদে ফিরিয়া আসিলেন। আগ্রায় বসিয়া ঔরঙ্গজেব কমবক্ত হিন্দুর এই স্পর্দ্ধার কাহিনী শুনিয়া ক্রোধে কাঁপিয়া উঠিলেন। তাঁহার মাতুল আমীর উল্-ওমরাহ্ সায়েস্তা খাঁর অধীনে তৎক্ষণাৎ একদল মুঘল সৈন্য ও যশোবন্ত সিংহের অধীনে একদল রাজপুত সৈন্য, মারাঠি কাফেরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল।

শায়েস্তা খাঁ আসিয়া পুনা ও চাকুন জয় করিয়া লইলেন; কিন্তু সহজে নহে। ৫৬ দিন অবরোধের পর দুর্গপ্রাচীরের একাংশ যখন শায়েস্তার কামানের গোলায় ধ্বংস হইয়া গেল, তখন বীরদর্পে যুদ্ধ করিয়া, ফিরঙ্গজী নার্সাল্লা চাকুন দুর্গরক্ষার আশা ছাড়িয়া দিলেন। পুনায় মুঘল ফৌজের একটা কেন্দ্র হইল। শিবাজী রায়গড় ছাড়িয়া, সিংহগড়ে গিয়া আশ্রয়

লইলেন। পুনা নগরীতে শাহ্জীর সুসজ্জিত অট্টালিকায় সেনাপতি শায়েস্তার বাসা-বাড়ী নির্দিষ্ট হইল। নগরীর মধ্যে ফৌজদারের বিনা আদেশে কোন মারাঠার প্রবেশ-অধিকার রহিল না।

শায়েস্তা খাঁর অধীনে এক মারাঠা সেনানায়ক তাহার পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছিল। শিবাজীর দূতগণ তাহাকে অর্থ দিয়া বশীভূত করিল। বরযাত্রীর দল যখন বাজনা বাজাইয়া, বাজী পুড়াইতে পুড়াইতে, সোল্লাসে নগর-প্রান্ত দিয়া অগ্রসর হইতেছিল, তখন, যশজী কঙ্ক তানাজী মালশ্রী ও দুই শত জন মাওয়ালী যোদ্ধা লইয়া, ছদ্মবেশে সেই বরযাত্রীর দলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। তারপর রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া তিনি স্বদলবলে শায়েস্তা খাঁর বাসা-বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হন্। তখন রমজান মাস, মুসলমান প্রহরী ও ভৃত্যগণ সারাদিন রোজার পর রাত্রে খুব একচোট খাইয়া, নাসিকা গর্জ্জনে নিদ্রা যাইতেছিল। প্রথমে রান্না-বাড়ী দিয়া তাঁহারা বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া, দোতলার একটা ভাঙ্গা জানালা দিয়া একেবারে শায়েস্তা খাঁর শয়নকক্ষে গিয়া হাজীর হইলেন। শায়েস্তা খাঁর এক বেগম জাগিয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন; শায়েস্তা জাগিয়া উঠিয়া একলম্ফে জানালার ধারে আসিলেন; নীচের প্রহরীরা সচকিত হইয়া উঠিল। শিবাজীর সঙ্গিগণ নিদ্রিত ও অর্দ্ধ নিদ্রিত প্রহরীদের হত্যা করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "তোরা বুঝি এমনি করিয়া

ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া পাহারা দিস্‌ ? *" গোলমালের মধ্যে শায়েস্তা খাঁ পলাইলেন বটে, কিন্তু পলায়ন-কালে শিবাজীর তরবারির আঘাতে তাঁহার একটা অঙ্গুলি ছিন্ন হইয়া গেল। তারপর ৬জন বাঁদী, ৪০ জন প্রহরী ও সায়েস্তার ছেলে আবদুল ফতে খাঁকে কচুকাটা করিয়া, শিবাজী অদ্ভুত দুঃসাহসের পরিচয় দিয়া, রাতারাতি সিংহগড়ে ফিরিয়া আসিলেন (১৬৬৩, ৫ই এপ্রিল)।

তাঁহার পিছনে পিছনে এক দল মুঘল সৈন্য তাড়া করিয়া সিংহগড় পর্য্যন্ত আসিল। কিন্তু দুর্গ অবরোধ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সম্মুখে দিক দিয়া নেতাজী ফলকার ও পশ্চাৎ দিক দিয়া কর্ত্তাজী গুজার বাহির হইয়া, মুঘল বাহিনীকে সাঁড়াশীর মত টিপিয়া ধরিলেন। কোনরূপে একটু পথ করিয়া, মুঘলেরা কামান-বন্দুক ফেলিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কর্ত্তাজী তাঁহার ঘোড়্‌সওয়ার দল লইয়া, তাহাদের তাড়া করিয়া পুণা পর্য্যন্ত হটাইয়া দিলেন। শিবাজীর নিকট মুঘলের এই প্রথম পরাজয়।

১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে চারি হাজার অশ্বারোহী লইয়া শিবাজী মুঘল ভারতের সর্ব্বপ্রধান বন্দর সুরাট আক্রমণ করেন, সুরাট তখন দিল্লীর নিম্নেই সমৃদ্ধিশালী নগর। ইংরাজ

---

* "শিবাজী ও মুঘল শক্তির সংঘর্ষ"—স্যার যদুনাথ সরকার, 'প্রবাসী' আষাঢ়, ১৩৩৩, ৫৩৫ পৃষ্ঠা।

বণিকদল কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এখানে ও বোম্বাইয়ে এক-একটী প্রকাণ্ড উপনিবেশ ও দক্ষিণ কঙ্কণ রাজাপুরে ও কাড়ওয়ারে এক একটী কুঠি স্থাপন করিয়াছিল। ক্রমাগত আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরিয়া বন্দরের ঘর-বাড়ী ও জাহাজ লুণ্ঠিত হয়। ইংরাজ ও পর্ত্তুগীজগণ নিজেদের কুঠি সামলাইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দুই চারিজন ইংরাজও শিবাজীর অনুচরদের হাতে ধরা পড়িয়াছিলেন; টাকা দিয়া তাঁহারা মুক্তি ক্রয় করেন। লুণ্ঠন-কালে মুসলমানের মস্‌জিদ ও খৃষ্টানের গীর্জ্জার প্রতি মারাঠারা কোনরূপ অত্যাচার করে নাই। তদুপরি কোন ক্ষেত্রেই স্ত্রীলোক বা বালকের প্রতি বল-প্রকাশ শিবাজী-সৈন্যদলের নীতিবিরুদ্ধ ছিল।

এই সময় শাহ্‌জীর মৃত্যু হইলে, তিনি সিংহগড়ে মহা ধুম-ধামের সহিত পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। তারপর রায়গড়ে আসিয়া প্রকাশ্য দরবারে নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাঁহার নামে মুদ্রা ঢালাই করিয়া, দেশময় প্রচলনের আদেশ জারী করা হইল। উত্তরাধিকার-সূত্রে তিনি পণ্ডিচেরীর দক্ষিণে পোর্টোনোভো বন্দর, তাঞ্জোর জেলার বিস্তৃত জায়গীর ও আর্ণীর অতিকায় দুর্গ প্রাপ্ত হইলেন। ওদিকে আরব্য উপসাগরে শতাধিক একপালের বড় বড় নৌকা ও কয়েকখানি তিন-পালের জাহাজ শিবাজীর প্রতাপ জ্ঞাপন করিয়া, বন্দরে বন্দরে ঘুরাফিরা করিতে লাগিল। শিবাজীর নৌবহরের সতর্ক চক্ষু এড়াইয়া পশ্চিম উপকূল হইতে কোন

মক্কাগামী যাত্রি-জাহাজই নিরাপদে যাইতে পারিত না ; মারাঠী নাবিকের দল তাহাদিগকে আটক করিয়া, ধনসম্পৎশালী তীর্থ-যাত্রীর নিকট হইতে প্রচুর ধন-রত্ন আদায় করিত। শিবাজী নিজে একবার (১৬৬৫ খৃঃ অঃ) ৮৮ খানি পালের জাহাজে প্রায় চারি হাজার সৈন্য লইয়া গোয়ার একশত ত্রিশ মাইল দক্ষিণে বানিলোর নামক ধনশালী শহরের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। নগর লুণ্ঠন করিয়া ফিরিবার পথে তিনি গোকর্ণ তীর্থ (পরশুরাম-ক্ষেত্র) দর্শন করেন ও ব্রাহ্মণদের বহু অর্থ প্রণামী দেন। কাড়ওয়ার নগরও অবরোধ করিয়া, সেখানকার অধিবাসীদের নিকট হইতে চৌথ আদায় করেন ; স্থানীয় ইংরাজ বণিকেরাও সমগ্র চৌথে প্রায় ষোলো শত টাকা চাঁদা দিয়াছিলেন।

যশোবন্ত সিং ও সায়েস্তা খাঁকে আগ্রায় ডাকিয়া পাঠাইয়া, ঔরঙ্গজেব অম্বর-অধিপতি মহারাজ জয়সিংহ ও পাঠান সেনাধ্যক্ষ দিলীর খাঁকে দাক্ষিণাত্যে শিবাজী-দমনে প্রেরণ করিলেন। প্রথম প্রথম মাওয়ালী সৈন্যগণ ইহাদিগের সহিত গরিলা-যুদ্ধ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। তারপর দিলীর খাঁকে পুরন্দর দুর্গ অবরোধের ভার দিয়া মহারাজ জয়-সিংহ স্বয়ং তাঁহার রাজপুত বাহিনী লইয়া সিংহগড় আক্রমণ করিলেন। দিনের পর দিন যুদ্ধ চলিল। ঔরঙ্গজেবের বহু-যুদ্ধজয়ী সেনাপতিদ্বয়ের তেজোগর্ব্ব মারাঠাদের যুদ্ধ-নৈপুণ্যের নিকট ম্লান হইয়া গেল।

এদিকে পুরন্দর দুর্গের হাবিলদার মোরার বাজী

পন্তু* হাজার ছুইয়েক সেনা লইয়া, পঞ্চপালসম অসংখ্য পাঠান ও মুঘল-বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। সমতল ভূমি হইতে চৌদ্দ শত ফুট উচ্চে পাহাড়ের উপর বিখ্যাত পুরন্দর দুর্গ অবস্থিত। একশত ফুট নীচে একটা টিলার উপর দুর্গের নিম্নাংশ এবং একশত ফুট উচ্চে খাড়া পর্ব্বতোপরে দুর্গের উর্দ্ধাংশ; দুর্গটি যেন দোতালা। দিলীর অসহিষ্ণু হইয়া ক্রমাগত তোপ দাগিতে লাগিলেন এবং বারুদ দিয়া নিম্নদুর্গের গম্বুজ ও প্রস্তর-প্রাকার উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। একদিন বহু চেষ্টায় দুর্গ-প্রাকারের খানিকটা স্থান ভগ্ন হইয়া গেল। ফাঁক পাইয়া দলে দলে শত্রু-সৈন্য আসিয়া নিম্ন দুর্গ দখল করিয়া ফেলিল; কিন্তু উর্দ্ধ দুর্গ তখনও মোরার বাজী প্রভুর দখলে। তিনি উপর হইতে সিংহ-বিক্রমে মোগল-পাঠানদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তুমুল হাতাহাতি লড়াই লাগিয়া গেল; পাহাড়ের গায়ে রক্তের ঝর্ণা বহিল। প্রাকারের নিকট হস্তিপৃষ্ঠে বসিয়া দিলীর খাঁ সৈন্যদের পরিচালনা করিতে-ছিলেন। মোরার বাজী বাঁচিয়া থাকিতে সম্পূর্ণ দুর্গজয়ের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, তিনি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এক তীর ছুড়িলেন। মোরার বাজীর প্রাণ গেল; কিন্তু তাহার দলবল নিষ্প্রাণ হইয়া পড়িল না। শেষে বহু সৈন্য ক্ষয় করিয়া, দিলীর খাঁ সদলে ক্ষুব্ধচিত্তে নামিয়া আসিলেন।···তারপর বর্ষা নামার সঙ্গে সঙ্গে মুঘল শিবির নিঝুম হইয়া পড়িল।

* বলাবাহুল্য, গজপুর যুদ্ধের বীর বাজী পন্তু আর ইনি আতন্ত্র নহেন।

এদিকে কিন্তু সিংহগড়ের অবস্থা ভীষণ কাহিল।…রায়গড় দুর্গে বসিয়া শিবাজী তখন গম্ভীর চিন্তামগ্ন। রাত্রে তিনি এক দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন, ভবানী দেবী যেন আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে স্বজাতি হিন্দুর সহিত যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিতেছেন; নতুবা পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। স্বপ্নের কুসংস্কার তখনকার উচ্চ-নীচ সকলের মনেই একটা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অর্ঘ্য পাইত। তদুপরি শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামী তাঁহাকে হিন্দুর স্বার্থ-সংরক্ষণে সর্বদা যত্নবান থাকিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। সামুদ্রিক অভিযানে গিয়া তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল; তজ্জন্য তাঁহার মানসিক স্বাস্থ্যের অভাব হওয়াও কিছু বিচিত্র নহে। তিনি কয়েক জন অমাত্যের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্মানজনক সর্তে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন।

জয়সিংহ এত শীঘ্র দুর্দ্ধর্ষ মারাঠা বীরের নিকট হইতে সন্ধির প্রস্তাব আশা করেন নাই। দূত রঘুনাথ পন্থ ন্যায়শাস্ত্রী যখন জয়সিংহের নিকট শিবাজীর বশ্যতার বার্ত্তা বহন করিয়া আনিলেন, তখন অম্বরাধিপতি বিস্মিত হইলেন, সরল প্রাণে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। অবশেষে শিবাজী লুকাইয়া তাঁহার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। অনেক কথাবার্ত্তার পর স্থির হইল যে, শিবাজী মুঘল সম্রাটের ক্ষমা-প্রাপ্তির অঙ্গীকারে মুঘলদের বত্রিশটি দুর্গের মধ্যে সিংহগড় ও পুরন্দর সমেত কুড়িটি দুর্গ এবং তৎসন্নিহিত জমিজমাগুলি ফিরাইয়া দিবেন; কেবল বিজাপুরের এলাকায় অর্জ্জিত সমস্ত

সম্পত্তির উপর তাঁহার স্বত্বস্বামিত্ব প্রতিষ্ঠিত রহিল ; কিন্তু তজ্জন্য তিনি দিল্লী-সরকারকে খাজনা দিতে বাধ্য থাকিবেন। তিনি ও তাঁহার অষ্টম বয়স্ক পুত্র শম্ভুজী মুঘল-সরকারে সামন্ত রাজার উপযুক্ত কোন সম্মানজনক চাকুরী লইবেন ; আহমেদ-নগর ও জুন্নারে তাঁহার যে পৈত্রিক সম্পত্তি অন্যায়ভাবে সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, তৎপরিবর্তে বিজাপুর রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমঘাটের তরফে তিনি নূতন জমিদারি পত্তনি পাইবেন।

ঔরঙ্গজেব এই সন্ধির খশ্‌ড়া মঞ্জুর করিয়া পাঠাইলেন এবং শিবাজীকে ক্ষমা করিয়া এক পত্র লিখিলেন ; উহাতে তাঁহাকে বিজাপুর রাজ্য-জয়ে সাহায্য করিতে এবং পরে আগ্রায় গিয়া তাঁহার দরবারে সামন্তরাজ-রূপে হাজীর হইতে হুকুম দেওয়া হইল।

বিজাপুর সুলতানের খাজনা বাকী পড়িয়াছিল ; তাহা ছাড়া দরবারের ভিতর অমাত্যে-অমাত্যে ঘৃণ্য দলাদলি ও মারামারি নিত্য লাগিয়া ছিল। এই সকল ত্রুটির সুযোগ লইয়া ঔরঙ্গজেবের আদেশে জয়সিংহ বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন ; শিবাজী তাঁহার আনুগত্য হাতে-কলমে প্রমাণ করিবার জন্য জয়সিংহের সহিত আট হাজার মাওয়ালী পদাতিক ও দুই হাজার বর্গী লইয়া যোগ দিলেন। ফুলতান্ জেলা ও তাথোরা দুর্গ অল্প চেষ্টায়ই দখল হইয়া গেল। রাজধানীর অনতিদূরে মঙ্গলবেড়া নামক স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া জয়সিংহ ও শিবাজী খাণ

বিজাপুরী সৈন্য-বাহিনীর সম্মুখীন্ হইলেন। যুদ্ধে তাহারা টিঁকিতে পারিল না। সুলতান মুঘলের যথাসাধ্য দাবী মিটাইয়া কিছুদিনের মত শান্তি স্থাপন করিলেন বটে; কিন্তু জয়সিংহ তাঁহার সৈন্যদল লইয়া নিকটেই রহিয়া গেলেন।

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে শিবাজী পাঁচশত অশ্বারোহী ও একহাজার মাওয়ালী পদাতিক লইয়া আগ্রা যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে তাঁহার মাতা জীজীবাঈকে রাজপ্রতিনিধি ও পেশওয়া মোরেশ্বর ত্রিমল্ পিঙ্গলেকে (ডাক্‌নাম 'মোরো পন্থ') সহকারী রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া গেলেন। আবাজী সন্দেও ও অন্নজী দত্ত সমস্ত দুর্গ ও সৈন্যদলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্ম্মচারী হইয়া রহিলেন। দুই মাস পরে আগ্রা নগর-প্রান্তে উপনীত হইয়া শিবাজী তাঁহার 'প্রত্যুদ্গমনের কোন উদ্যোগ-আয়োজন না দেখিয়া একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন। তারপর দরবারে তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর ওমরাহদের এক পাশে বসিতে দেওয়া হইল; ইহাতে তিনি নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন। প্রকাশ্যে ইহার প্রতিবাদ করিয়া, শিবাজী সদম্ভে আম্ দরবার হইতে চলিয়া আসিলেন। পরদিন তিনি অনুচর সহ দিল্লী পরিত্যাগ করিবার প্রার্থনা করিতেই ঔরঙ্গজেব তাহা মঞ্জুর করিলেন। অনুচরগণ রওনা হইল বটে, কিন্তু শিবাজী ও শম্ভুজী তাঁহাদের গৃহে আটক্ হইলেন। মুঘল সিপাহী তাঁহার বাসভবনের চতুর্দ্দিকে পাহারা দিতে লাগিল,—বাহিরে আসিবার হুকুম নাই!

বিপদে পড়িয়া শিবাজী খুব কম সময়েই ধৈর্য্যচ্যুত বা বিচলিত হইতেন। মুক্তি পাইবার আশায় তিনি নানারূপ ফন্দী আঁটিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি প্রতি বৃহস্পতিবারে পূজার্চ্চনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। ঐ উপলক্ষে প্রতিদিন প্রচুর ব্রাহ্মণ-কাঙ্গাল ও রাজপুরুষ ওমরাহদিগকে বিতরণের জন্য বড় বড় বেতের ঝুড়ি বোঝাই করিয়া মিঠাই পাঠাইয়া দেওয়া হইত। প্রথম প্রথম সান্ত্রীরা সেগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিত, কিন্তু ক্রমশঃ তাহাদের পরীক্ষার কড়াকড়ি শিথিল হইয়া আসিল। সুযোগ বুঝিয়া, এক বৃহস্পতিবার তিনি অসুখের ভাণ করিলেন; সেদিন আর পূজার্চ্চনা করা হইল না। পরের বৃহস্পতিবার সুস্থ হইয়া, তিনি বিশেষ ধুমধামের সহিত পূজার্চ্চনা করিলেন। সন্ধ্যার পরই বড় বড় ওড়ার মধ্যে করিয়া নানারূপ প্রসাদ শহরের বিভিন্ন দিকে চালান হইতে লাগিল। একটি ওড়ার মধ্যে শিবাজী ও অন্য একটির মধ্যে শম্ভুজী লুকাইয়া ছিলেন; বিশ্বস্ত বাহকগণ তাঁহাদিগকে বহন করিয়া শহরের প্রান্তভাগে লইয়া আসিল। সেখানে বহু কষ্টে একটা ঘোড়া যোগাড় করিয়া, শিবাজী তাঁহার নয় বৎসর বয়স্ক পুত্রকে পশ্চাতে লইয়া, মথুরার দিকে ঘোড়া ছুটাইলেন।

ফিরিবার পথে তানাজী মালশ্রী প্রমুখ কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর শিবাজীর বন্দীত্বের সংবাদ পাইয়া, মথুরায় রহিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে শম্ভুজীকে রাখিয়া, তিনি সন্ন্যাসীর বেশে নানা তীর্থ ঘুরিয়া নয় মাস পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ইতোমধ্যে জয়সিংহ আবার বিজাপুরের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার সম্রাট্-প্রভুর আদেশ—বিজাপুরকে যে-কোন উপায়ে হোক্ মুঘল-সাম্রাজ্য-ভুক্ত করা। সুতরাং পুনরায় বিজাপুরী রাজধানী আক্রান্ত হইল। কিন্তু জয়সিংহ পদে পদে হারিতে লাগিলেন; অবশেষে তিনি পরাজয়ের কালিমা সর্বাঙ্গে মাখিয়া আওরঙ্গাবাদে ফিরিয়া আসিলেন। শিবাজীর প্রত্যাগমনের সঙ্গে সঙ্গেই আবার মারাঠাদের সুপ্ত শক্তি দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল। শিবাজী সিংহগড়, পুরন্দর ও লৌহগড় বাদে নিজ জায়গীরের বাকী দুর্গগুলির একে একে পুনরুদ্ধার ও সংস্কার সাধন করিলেন। কঙ্কনের কতকাংশও তাঁহার হাতে আসিল।

শিবাজী আগ্রা যাত্রা করিয়া রাষ্ট্রীয় চালে একটা মস্ত গলদ্ করিয়াছিলেন। মারাঠা জাতির মধ্যে যখন ঐকতার দানা সবে মাত্র বাঁধিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে, স্বাধীনতার ইমন কল্যাণ যখন প্রাণকাড়া সুরে মহারাষ্ট্রের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে জাগরণের মূর্চ্ছনা জাগাইয়াছে, তখন তাঁহার মুঘলের নিকট এত অনায়াসে দুর্ব্বলতার পরিচয় দেওয়াটা হয়ত উচিত হয় নাই। কিন্তু সে ভুল সংশোধনের জন্য তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। এক বৎসর কালের অনুপস্থিতিতে তাঁহার অনুরক্ত অনুচরবৃন্দের মনের মধ্যে কোন নৈরাশ্যের ছায়া পড়ে নাই, রাজ্যের মধ্যে কোথাও একটু ভাঙন ধরে নাই। শুধু তাহা নহে, তাঁহার কোন কর্ম্মচারী বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই—প্রত্যেকেই অবিচলিতভাবে স্বীয় কর্ত্তব্যপালন করিতেছিলেন। বীরপ্রসবিনী

জীজীবাঈও অপূর্ব্ব বুদ্ধিমত্তার সহিত পুত্রের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন।

একটা 'মারাঠা মূষিকের' নিকট প্রবল প্রতাপান্বিত দিল্লী-সম্রাট্ কূট-বুদ্ধিতে এমনভাবে পরাজিত হইলেন দেখিয়া, ঔরঙ্গজেব সত্যই হতভম্ব হইয়া গেলেন। ইঁহাকে দমন করিতে গেলে কতখানি তোড়্জোড়্ করা আবশ্যক, তিনি তাহাই দিবারাত্র চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় রাজপুত্র মুয়াজ্জামের এক পত্র আসিল দাক্ষিণাত্য হইতে। তিনি তখন দাক্ষিণাত্যের মুঘল প্রতিনিধি, যশোবন্তসিংহ তাঁহার সহকারী ও সেনাপতি। শিবাজীর সহিত শত্রুতা না করিয়া বন্ধুত্ব করাই সাম্রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক, এই কথাই সেই পত্রে লেখা ছিল এবং কি কি সর্ত্তে এই বন্ধুত্ব স্থাপিত হইতে পারে—তাহারও একটা খশ্ড়া ঐ পত্রে দেওয়া হইয়াছিল। ইতোমধ্যে শিবাজী নিজেও একখানা পত্র সম্রাটকে ও একখানা পত্র যশোবন্ত সিংহকে লিখিয়া শান্তি-প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেব কতকটা অনিচ্ছার সহিতই কুমার মুয়াজ্জামের সুপারিশ্ মঞ্জুর করিলেন। তদনুসারে শিবাজীর 'রাজা' উপাধি বাদ্শাহ্ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইল; পুনা, চাকুন ও সোপা জেলা এবং সিংহগড় ও পুরন্দর বাদে তন্মধ্যস্থ সমস্ত দুর্গ তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল; বেরারে তিনি এক বিশাল জায়গীর পাইলেন এবং তাঁহার দশ বৎসর বয়স্ক পুত্র শম্ভুজী মুয়াজ্জামের অধীনে পাঁচ হাজারী মনসব্দার হইলেন (১৬৬৮ খৃঃ অঃ)

জয়সিংহের অধীনে মুঘল-শক্তির পরাজয়ে বিজাপুর-সুলতান বিশেষ খুশী হইতে পারেন নাই, কারণ তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন—মুঘল্ বাদ্শাহর খড়্গ পূর্ব্বাপেক্ষা শাণিত হইয়া আবার তাঁহার স্কন্ধে শীঘ্রই পতিত হইবে। তিনি আগ্রায় সন্ধির দরবার করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু শিবাজী কুমার মুয়াজ্জাম ও যশোবন্তের নিকট এই সন্ধির প্রস্তাবে তাঁহার ঘোরতর আপত্তি জানাইলেন; কারণ ইতোপূর্ব্বে তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্যজয়ে মুঘল্কে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন এবং মুঘল পক্ষও বিজাপুর ও গোল্কুণ্ডার উপর আদায়ী করের একচতুর্থ ও একদশমাংশ ('চৌথ' ও 'সর্দেশ-মুখী') শিবাজীকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। শিবাজীর প্রতিবন্ধকতায় পাছে সন্ধি কাঁচিয়া যায়—এই ভয়ে বিজাপুরের উজীর আব্দুল মোহাম্মদ তাঁহার সহিত এক গোপন সন্ধি করিয়া, বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অতঃপর আলি আদিল শাহ্ ও ঔরঙ্গজীবের মধ্যে নির্ব্বিবাদে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়া গেল।

গোলকুণ্ডার কুতবশাহী সুলতানও শিবাজীকে বাৎসরিক পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়া, এক গোপন সন্ধিপত্রে সহি করিলেন।

শিবাজীর হেঁটমুণ্ড আবার দেখিতে দেখিতে উঁচু হইয়া উঠিল, দাক্ষিণাত্যে তিনি অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন। এবার তিনি কঙ্কন-বিজয় সম্পূর্ণ করিতে উদ্যোগী হইলেন।

প্রথমেই তাঁহার নজর গেল পর্তুগীজ-অধিকৃত গোয়া ও দক্ষিণ কঙ্কনের সুরক্ষিত শ্রেষ্ঠ বন্দর জিঞ্জীরার উপর। কামানের অপ্রাচুর্য্যে ও নৌসৈন্যের উপযুক্ত শিক্ষার দৈন্যে তিনি তখনকার মত গোয়া আক্রমণ স্থগিত রাখিয়া, শিদ্দীদিগের রাজধানী জিঞ্জীরার অভিমুখে এক বিরাট সৈন্যদল প্রেরণ করিলেন। বহু কষ্টে জিঞ্জীরার একাংশ লুণ্ঠিত ও অধিকৃত হইল বটে, কিন্তু শিদ্দীরা সমুদ্রের দিক হইতে যথেষ্ট প্রবল রহিয়া গেল। তখন শিবাজী স্বরাজ্যে ফিরিয়া, কিছুদিন পর্য্যন্ত চুপ্‌চাপ রহিলেন। এই সময় তিনি রাজ্যের শাসন-সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। প্রায় দুই বৎসর কাল দাক্ষিণাত্যে পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল।

কিন্তু ঔরঙ্গ্‌জেব শান্তিতে ছিলেন না। শিবাজী-দমন যেন তাঁহার জপমালা হইয়া উঠিয়াছিল। তারপর তিনি বুঝিতে পারিলেন, কুমার মুয়াজ্জাম্ ও রাজপুত-সেনাপতি যশোবন্ত সিংহ শিবাজীর উৎকোচ ও উপহারের মন্ত্রে উঠেন-বসেন। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই তিনি কুমার মুয়াজ্জামের নিকট এক ফার্ম্মাণ পাঠাইয়া—শিবাজীকে, ঔরঙ্গাবাদে উপস্থিত তাঁহার রাজদূতকে, মন্‌সব্‌দার প্রতাপরাও গুজর ও তাঁহার অন্যান্য দলপতিগণকে কৌশলে গ্রেপ্তার করিতে হুকুম দিলেন। কিন্তু গ্রেপ্তারের পূর্ব্বেই খবর পাইয়া, মারাঠা-দূত নীরজী রাবজী ও প্রতাপ রাও তাঁহার পাঁচ হাজার সৈন্য লইয়া রাতারাতি পলায়ন করিলেন; এবং শিবাজীকে আসিয়া ঔরঙ্গজেবের দুষ্ট অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন।

মহারাষ্ট্র-রাজের প্রতিহিংসা-বহ্নি পুনরায় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। মুঘলের ধ্বংস-সাধনে তিনি মা ভবানীর নিকট কাতরভাবে করুণা ভিক্ষা করিলেন। বড় সাধের সিংহগড় ও পুরন্দর দুর্গ প্রায় পাঁচ বৎসর কাল মুঘলের কবলে, অবিলম্বে তাহাদের উদ্ধার-সাধন করিতে হইবে! সিংহগড়েই তানাজী মালশ্রী কয়েক বৎসর যাবৎ কেল্লাদার ছিলেন, তিনিই একদিন প্রচণ্ড সাহসে এই কেল্লা বিপক্ষের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়াছিলেন। এক হাজার মাওয়ালী সৈন্য সাথে লইয়া, একদিন তানাজী সিংহগড় পুনরুদ্ধার করিতে রায়গড় হইতে যাত্রা করিলেন।

কৃষ্ণা নবমীর অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া, এক হাজার মাওয়ালী যোদ্ধা বন-বিড়ালের মত নিঃশব্দে সিংহগড়ের পাদ-মূলে আসিয়া উপস্থিত হইল। দড়ীর সিঁড়ি বাহিয়া ৩০০ সৈন্য দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে, এমন সময় রাজপুত সান্ত্রীরা টের পাইয়া শিঙ্গা বাজাইয়া দিল। মুঘল ও রাজপুতের দুই হাজার সৈন্য তিন শত মাওয়ালীকে মুঠার মধ্যে পাইয়া ভীষণ-ভাবে আক্রমণ করিল। অস্পষ্ট মশালের আলোকে নির্জন পাহাড়ের বুকে মৃত্যুর সে কী নিষ্ঠুর রক্ত-হোলির উৎসব! মাওয়ালী মরিয়া হইয়া লড়িতে লাগিল। এমন সময় তানাজী মালশ্রী বর্শাবিদ্ধ হইয়া চিরনিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িলেন। এক শত মাত্র মাওয়ালী তখন অবশিষ্ট; নেতার পতনে তাহারা পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

সেই সময় তানাজীর ছোট ভাই সূর্য্যাজী মালশ্রী আরও তিন শত মাওয়ালী লইয়া, দুর্গমধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন। পলায়নপর সৈন্যদের পথ রুখিয়া, সূর্য্যাজী বজ্রকণ্ঠে হাঁকিয়া বলিলেন, "তোমরা কী সেনাপতি তানাজীর মৃতদেহ এমনি করে' শত্রুর হাতে ফেলে যাবে? তাঁহার পবিত্র দেহ কি শিয়াল কুকুরে খা'বে—তাঁর হাড় ক'খানা কি মেথর-খাঙড়ে গোর দেবে? কোন্ লজ্জায় তোমরা মহারাজ শিবাজীর কাছে গিয়ে মুখ দেখাবে? ছিঃ, মাওয়ালী বাপ্ কি তোমাদের জন্ম দেয় নি? *এস, যুদ্ধ কর, জয় কর!"* সূর্য্যাজীর অগ্নিমন্ত্রে ক্ষিপ্ত হইয়া মাওয়ালীরা আবার শত্রুর সম্মুখীন হইল। এই সময় অবশিষ্ট চারিশত মাওয়ালীও দুর্গদ্বার ভাঙিয়া বন্যার মত ভিতরে প্রবেশ করিল। 'হর হর মহাদেও'-শব্দে তাহারা চিতাবাঘের মত, খড়্গ ও কুড়ুল হস্তে, শত্রুদলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

পরদিন রক্তের ঢেউয়ের উপর রক্তিম আলোকের পাখা মেলিয়া সূর্য্যদেব উঠিয়া সর্ব্ব প্রথমেই দেখিলেন—সিংহগড় মাওয়ালীদের হস্তগত। সাতশত রাজপুত ও মুঘল সৈন্য হতাহত; মাওয়ালী পক্ষের হতাহতের সংখ্যা মাত্র তিনশত। শিবাজী সিংহগড়-বিজয়ের সংবাদে আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন! কিন্তু বাল্যবন্ধু তানাজীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া দুই চক্ষু তাঁহার জলে ভরিয়া গেল; রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "সিংহের গুহা ফিরে পাওয়া গেল, কিন্তু সিংহ যে নিহত! একটা দুর্গ লাভ করলুম, কিন্তু তানাজীর মত বন্ধুকে জন্মের মত হারালুম!"

ইহার একমাস পরে পুরন্দর দুর্গও পুনরধিকৃত হয়। তারপর একে একে সমগ্র কঙ্কন প্রদেশ শিবাজীর হাতে ফিরিয়া আসিল। ১৬৭০ সালে দ্বিতীয় বার সুরাট আক্রান্ত ও বন্দরের অর্দ্ধাংশ আগুণে পোড়াইয়া দেওয়া হয়। ইংরাজ বণিকদের অনেকেই ধনরত্ন লইয়া পলাইয়া ছিলেন; কয়েকজন ইংরাজ শিবাজীকে উপহারেও তুষ্ট করিয়াছিলেন। তিন দিন ধরিয়া সমস্ত শহর অকাতরে লুণ্ঠিত হইয়াছিল। প্রভূত ধনরত্ন সহ দেশে ফিরিবার কালে পাঁচ হাজার মোগল সৈন্য তাঁহাকে নাসিকের নিকট দুই দিক হইতে আক্রমণ করে। কিন্তু বহু কষ্টে শিবাজী সে সঙ্কট হইতে অক্ষত দেহে বামাল সমেত বাহির হইয়া আসেন।

কয়েক মাস পরে প্রতাপ রাও গুজর খান্দেশ-জয়ে বহির্গত হন। মুঘল ফৌজদার ও কেল্লাদারগণ সেখানেও কাবু হইয়া পড়িল। বড় বড় নগর অবরুদ্ধ ও লুণ্ঠিত হইল। এক এক জেলা হইতে সৈন্যদের খোরপোষের খরচ বাবদ মোটা মোটা 'খান্দানি' দেশমুখদের নিকট হইতে জোর করিয়া আদায় করা হইল। এই অভিযানের একটা স্মরণীয় ঘটনা হইল এই যে, শিবাজীর আদেশ অনুসারে প্রতাপ রাও সমগ্র খান্দেশের উপর স্থায়ী বাৎসরিক 'চৌথ' ধার্য্য করেন; অর্থাৎ প্রত্যেক মারাঠি দেশমুখ ও মুসলমান জমিদারকে ডাকাইয়া এইরূপ এক একটা কবুলিয়ৎ লিখাইয়া লইলেন যে, তাঁহারা মুঘল সম্রাটকে যে পরিমাণ কর দেন, তাহার এক চতুর্থাংশ শিবাজীকে প্রতি কিস্তিতে দিতে বাধ্য থাকিবেন।

তারপর ১৬৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৭২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বেরার প্রদেশের পূর্ব অংশ, বাগ্‌লানা, নাসইর, সালহারী, আউন্ধ, পুনা প্রভৃতি স্থানগুলি শিবাজীর রাজ্যভুক্ত হয়। অবশেষে ঔরঙ্গজেব সেনাপতি মহব্বৎ খাঁ ও দাউদ খাঁর অধীনে চল্লিশ হাজার সৈন্য শিবাজী দমনে পাঠাইয়া দিলেন। কুড়ি হাজার মুঘল সদর্পে চাকুন দুর্গ আক্রমণ করিয়া, দুই হাজার দুর্গরক্ষী মারাঠা সৈনিককে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। মোরো পন্থ ও প্রতাপ রাও গুজর তাড়াতাড়ি কুড়ি হাজার অশ্বারোহী লইয়া মুঘলদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে ছুটিয়া গেলেন। সমানে সমানে যুদ্ধ—উভয় পক্ষই নাছোড়্‌বান্দা। দুই পক্ষে শত শত সৈন্য হতাহত হইতে লাগিল। অবশেষে বিজয়লক্ষ্মী মহারাষ্ট্রদিগের গলায় জয়মাল্য পরাইয়া দিলেন। মুঘলগণ রণে ভঙ্গ দিল; মারাঠাদের হাতে বাইশ জন নামজাদা মুঘল সেনানায়ক বন্দী হইলেন।

শিবাজী শত্রুপক্ষীয় বন্দীদের প্রতি যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিলেন; আহতদের শুশ্রূষার যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করিলেন। মুঘল বীরগণ তাঁহার ভদ্র ব্যবহার দেখিয়া মোহিত হইয়া গেল। আহত শত্রুগণ আরোগ্যলাভ করিলে, তিনি তাহাদিগকে সসম্মানে মুক্তি দিলেন। কয়েক শত মুঘল ও পাঠান বন্দী শিবাজীর অধীনে চাকরী লইল। এই ঘটনার পর শিবাজী-দমনের আশা ঔরঙ্গজেবের মনে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে লাগিল।

১৬৭৩ সালে দ্বিতীয় আলি আদিল শাহের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পাঁচ বৎসরের একমাত্র পুত্র সিংহাসনে বসিলেন। এখানে অমাত্যদিগের মধ্যে দলাদলি চরমে উঠিল, রাজ্যশাসনেও যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। এই সময় শিবাজী এক এক করিয়া বিজাপুর-ভুক্ত স্থানসমূহ দখল করিতে লাগিলেন। বিজাপুরের সমস্ত ফৌজ কয়েক মাস প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে রুখিতে পারিল না। কঙ্কনের সর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্তে হুবলী, কাড়বার, আঙ্কোলা ও সমুদ্র তীরবর্ত্তী সমস্ত স্থান শিবাজীর নৌ-সৈন্যগণ অধিকার করিয়া ফেলিল। বেদনোরের রাজা বিজাপুরের করদ ছিলেন, তিনি ভাবগতিক দেখিয়া তাড়াতাড়ি শিবাজীর আনুগত্য স্বীকার করিলেন। বিজাপুর রাজ্যের বড় বড় জেলা ও নগরে শিবাজী চৌথ বসাইলেন। ইতঃপূর্ব্বে গোলকুণ্ডা রাজধানী আক্রমণ করিয়াও, তিনি অজস্র হীরামুক্তা-সোণারূপা আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন।

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য এখন বস্তুতঃ শিবাজীর পদতলে। নর্মদা নদীর দক্ষিণ হইতে গোয়া পর্য্যন্ত সমগ্র মহারাষ্ট্র ভূমি তাঁহার করতলগত। কেবল জিঞ্জীরা বন্দর ও তাঁহার জন্মভূমি জুন্নার—তখনও মুঘল-পাঠানের অধিকারভুক্ত। ত্রিশ বৎসর কাল দারুণ অধ্যবসায়ের ফলে তিনি বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে শিবাজী সম্পূর্ণ হিন্দু প্রথায় যথোচিত আড়ম্বরে তাঁহার রাজ্যাভিষেক ক্রিয়ার আয়োজন করিলেন।

কাশীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গাগা ভট্ট আসিয়া, যাগযজ্ঞ করিয়া, মন্ত্রতন্ত্র পড়িয়া, যথাবিধি অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। রাজ্যের চতুর্দ্দিক হইতে করদ রাজা, মোকুন্দদারগণ, জমিদারগণ, বড় বড় রাজকর্ম্মচারী, প্রতিপত্তিশালী বণিক ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়া রায়গড়ে আসিয়াছিলেন। প্রকাশ, প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল। জীজীবাঈ ও রামদাস স্বামী অভিষেক-ক্রিয়ার আগাগোড়াই নব-নির্ম্মিত রাজ-দরবারে উপস্থিত থাকিয়া সকলের আদর আপ্যায়ণ করিয়াছিলেন। তখন হইতে মহারাজ শিবাজীর নাম হইল, ক্ষত্রিয়-কুলাবতংস শ্রীরাজাশিব ছত্রপতি মহাশয়'।

শিবাজী নিজেকে সোণা দ্বারা ওজন করাইয়া, সেই সোনা স্বহস্তে ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন; লক্ষ কাঙ্গালীকে ভূরিভোজন করাইয়া, তাহাদিগকে একটি করিয়া টাকা, একখানা করিয়া বস্ত্র দান করিয়াছিলেন। সেদিন শিবাজীর দীর্ঘ জীবন ও অটুট সুখ কামনা করিয়া, রাজ্যের যত হিন্দু, মুসলমান, পার্শী ও খৃষ্টান্ প্রজা আপন-আপন ধর্ম্ম-মন্দিরে প্রার্থনা করেন।

রাজ্যাভিষেকের পরদিন মহাত্মা রামদাস স্বামী সজ্জনগড়ে নিজ আশ্রমে ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময় ছত্রপতি শিবাজী আসিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, আপনাকে ত' কিছু প্রণামী দেওয়া হইল না!"

রামদাস হাসিয়া কহিলেন, "একদিন শত্রু-কবলগত স্থান-

গুলি তোমার নিকট প্রণামী চাহিয়াছিলাম। আজ সমস্ত মহারাষ্ট্র স্বাধীন। এই স্বাধীন রাজ্যের কয় ক্রোশ জমি তুমি আমায় দান করিতে পার ?"

শিবাজী উৎফুল্ললোচনে অকপট ভাবে বলিলেন, "গুরুদেব, সমস্তটুকুই পারি। পারি কেন—এই দিলাম।"—এই বলিয়া তিনি রাজবেশ খুলিয়া প্রভুর পায়ের কাছে রাখিলেন এবং একখানা গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করিলেন।···রাজা হরিশ্চন্দ্রের পার্শ্বে এত বড় দানের দৃষ্টান্ত আর বুঝি দেখা যায় নাই!

রামদাস স্বামী তাঁহাকে রাজপোষাক ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন, "বৎস, তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া নিষ্কামভাবে রাজ্যশাসন কর। সামান্য অন্যায়ে তোমার চাকুরী যাইবে। মনে থাকে যেন—তোমার প্রভু এই ভিক্ষুক,' আর তোমার প্রভুর প্রভু হইলেন ঈশ্বর!"

দ্বাদশ অধ্যায়

শিবাজীর রাজ্য-শাসন-প্রণালী ও শেষজীবন

শিবাজী মনে মনে জানিতেন যে, জীবনব্যাপী অধ্যবসায়ের ফলেও তিনি সমগ্র ভারতে একটা স্বাধীন হিন্দু রাজ্য সংস্থাপন করিতে পারিবেন না। সেইজন্য তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র মহারাষ্ট্রকে সর্ব্বপ্রথমে স্বাধীন করা এবং সেই স্বাধীনতার বোধ এমন পাকা বনিয়াদের উপর গঠন করিয়া যাওয়া— যাহাতে বহুকাল ধরিয়া শত ঝঞ্ঝা সহস্র বজ্রপাতেও উহা অটুট থাকিবে। যে সকল দেশে মহারাষ্ট্র জাতির অধিবাস নাই, সেই সকল দেশ মুঘল বা পাঠানদের নিকট হইতে জয় করিয়া, তিনি তাঁহার রাজ্যভুক্ত করিয়া লন্ নাই—কেবলমাত্র চৌথ ও সরদেশমুখী কর আদায় করিয়াই সন্তুষ্ট হইতেন। নিজ রাজ্য ও পররাজ্যের মধ্যে তিনি সর্ব্বদা একটা পার্থক্য রক্ষা করিয়া চলিতেন।

নিজ রাজ্যে তিনি নানা বিষয়ে শাসন সংস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার সামরিক ও বেসামরিক বিভাগ পরস্পরের সহযোগী ও মুখাপেক্ষী ছিল। গোলকুণ্ডা, বিজাপুর, বেদ্‌নোর প্রভৃতি ছোটবড় কয়েকটি রাজ্য তাঁহার করদ ছিল; তাঁহাদিগের রাজ্যশাসন ব্যবস্থায় তিনি নিজ মত স্থাপনের কচিৎ

চেষ্টা করিয়াছেন। খাস্ নিজ রাজ্যের সমগ্র ভূভাগকে তিনি চৌদ্দটী জেলায় বিভক্ত করিয়াছিলেন; এক একটী জেলার নাম দেওয়া হইয়াছিল 'দেশ' বা 'প্রান্ত'। প্রত্যেক প্রান্তে অনেকগুলি করিয়া গিরি-দুর্গ ছিল; এই দুর্গগুলিই ছিল তাঁহার রাষ্ট্রের প্রাণ। সমগ্র রাজ্যে প্রায় দুই শত আশীটি দুর্গ ছিল।

প্রত্যেক জেলা কয়েকটি মহাল বা পরগণায় বিভক্ত ছিল। এই পরগণার রাজস্ব আদায়ের ও জমিজমা সংক্রান্ত বিচারের সর্বময় কর্তা ছিলেন 'তরফদার' বা 'তালুকদার'। তিনি সরাসরিভাবে রাজার অধীন ছিলেন এবং পুরুষানুক্রমে উপভোগ্য জায়গীরের বদলে নির্দিষ্ট হারে বেতন পাইতেন। ইঁহাদের বেতন প্রায় একশত টাকা ছিল। কয়েকটি মহাল বা পরগণার উপর সুবাদার বা মামলাৎদার ছিলেন। তরফদারের অধীনে কারকুণগণ এক-একটী মৌজায় খাজনা আদায় করিতেন। প্রজার দেয় খাজনা চিরকালের জন্য একই হারে নির্দিষ্ট থাকিত না। মাঠে যখন শস্য জন্মিত, কারকুনরা তখন মাঠের পরিমাপ করিয়া, উহার খাজনা ঠিক করিয়া দিতেন। প্রত্যেক প্রজাকে, উৎপন্ন শস্যের যে বাজার-দর হইত, তাহার দুই পঞ্চমাংশ খাজনা হিসাবে সরকারে দিতে হইত। বড় বড় পথ ও বন্দরে আমদানী ও রপ্তানী মালের উপর শতকরা আড়াই টাকা করিয়া বাণিজ্য-শুল্ক আদায় করা হইত। ইংরাজ, পর্তুগীজ ও ফরাসী বণিকরাও এই শুল্ক দিতে বাধ্য থাকিতেন।

প্রত্যেক গ্রামের প্যাটেল্ ও কুল্‌কার্নী পূর্বের ন্যায় বাহাল

রহিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের বাঁধা মাহিনায় কাজ করিতে হইল। দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেদের সমস্ত ক্ষমতা তিনি লোপ করিয়া দিলেন, কেবল তাহাদের পৈত্রিক জায়গীরের উপসত্ত্ব ভোগ করিবার অধিকার দিলেন। জায়গীরে যে সকল প্রজা থাকিত, তাহাদের নিকট হইতে দেশমুখ কি হারে খাজনা আদায় করিবেন ও তাহার মধ্য হইতে কত অংশ রাজ-সরকারে জমা দিবেন, তাহা প্রতি বৎসর ফসলের গতিক বুঝিয়া ঠিক করিয়া দেওয়া হইত। শিবাজীর বিশ্বাস ছিল—জমিদারগণ অন্যায় ভাবে প্রজা-পীড়ন করিয়া যদৃচ্ছা টাকা আদায় করেন এবং রাজ-সরকারে নামমাত্র খাজ্না দিয়া একটা মোটা লাভের পরিমাণ নিজেরা উপভোগ করেন। ঐ টাকার বলে এক এক সময় দেশমুখরা এমন ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন যে, রাজাকেও তুচ্ছ করিতে পশ্চাৎপদ হন্ না। এই জন্য ছত্রপতি নূতন করিয়া আর কোন কর্ম্মচারীকে সকর বা নিষ্কর জায়গীর অথবা কাহাকেও ভূসম্পত্তির ইজারা দিতেন না।

'কেল্লাদার' পদবীযুক্ত এক একজন মারাঠা সৈন্যাধ্যক্ষ দুর্গের কর্ত্তা থাকিতেন। তাঁহার অধীনে একজন ব্রাহ্মণ 'সুব্নীস্' (বা হিসাব রক্ষক) ও একজন কায়স্থ 'কারকারীস্' (বা অস্ত্রে-শস্ত্রের গুদাম-রক্ষক ও রসদ্-সরবরাহকারক) থাকিতেন। কারাপ্রাচীর রক্ষা, দুর্গ মেরামত এবং প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করার জন্যও বিভিন্ন জাতীয় একদল দক্ষ কর্ম্মচারী ছিল। প্রতি দুর্গেই একজন করিয়া বৈদ্য থাকিতেন। প্রত্যেক সৈন্য নির্দ্দিষ্টহারে মাহিনা

পাইত এবং পালা করিয়া বৎসরে দুই মাস ছুটি পাইত। হাবিলদার ব্যতীত আর কেহ পরিবার লইয়া দুর্গে থাকিতে পারিত না।

প্রতি নয় জন পদাতিক সৈন্তের উপর একজন করিয়া 'নায়ক' নিযুক্ত থাকিত; প্রতি পঞ্চাশ জন সৈন্তের উপর একজন 'হাবিলদার' থাকিত। এক শত সৈন্তের উপরিস্থ কর্ম্মচারীকে 'জুম্‌লাদার' ও এক হাজারের উপরিস্থ কর্ত্তাকে 'এক হাজারী মন্‌সব্‌দার' বলা হইত। পাঁচ হাজারী মন্‌সব্‌দার যখন কোন যুদ্ধে প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করিতেন, তখন তাঁহাকে 'সর্‌-ই-নৌবৎ' বলা হইত।

অশ্বারোহী সৈন্যদের মধ্যে 'বর্গীর' ও 'শিলাদার' দুই জাতীয় সৈন্তই ছিল। শিবাজীর বিশ্বাসভাজন ও বহুকালের পরিচিত কর্ম্মচারী দিয়া গঠিত একদল নিজস্ব বর্গীর সৈন্ত ছিল, ইহাদের নাম 'পাগাহ্‌'। প্রতি পঁচিশ জন অশ্বারোহীর উপর একজন করিয়া হাবিলদার, প্রতি একশত পঁচিশের উপর একজন করিয়া জুম্‌লাদার এবং প্রতি ৬২৫ এর উপর একজন করিয়া সুবেদার নিযুক্ত থাকিত। ৬২৫০ জনের একটা ঘোড়সওয়ারী পল্টনের সেনাপতি ছিলেন পাঁচ হাজারী মন্‌সব্‌দার।

মহারাজ শিবাজীর সি-আই-ডি অর্থাৎ গুপ্তচর বিভাগও অত্যন্ত সুদক্ষ ও সুসংবদ্ধ ছিল। এই বিভাগের বড় কর্ত্তা ছিলেন বিহারীজী নায়েক নামক এক মারাঠা ব্রাহ্মণ। বিদেশী-দের গতিবিধি, শত্রু-সৈন্তের হালচালের অনুসন্ধান, বিপক্ষদলের

মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি করা অথবা সেনাধ্যক্ষদের ঘুষ দেওয়ার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি এক দলের কাজ ছিল; আর একদলের কাজ ছিল দেওয়ানী ও ফৌজদারী কর্ম্মচারীদের রীতি-চরিত্রের উপর নজর রাখা এবং পলাতক আসামীদের সন্ধান করা। কাহারও কোনরূপ বেচাল দেখিলে, কাহাকেও ঘুষ বা বখ্‌শীশ্ আদায় করিতে দেখিলে অথবা প্রজা-পীড়ন করিতে দেখিলে, আর রক্ষা ছিল না—তাহার চাকরী লইয়া টানাটানি পড়িয়া যাইত। নূতন কোন কর্ম্মচারী বাহাল হইবার সময় বিভাগীয় কর্ত্তার পরিচিত একজন পুরাতন রাজ-কর্ম্মচারীকে উহার বিশ্বস্ততা ও সচ্চরিত্রতার জন্য জামীন্ হইতে হইত।

সদর হইতে নিযুক্ত এক-একজন 'মজুমদার' পদবীযুক্ত ব্রাহ্মণ, জেলার সমস্ত দুর্গ ও সুবার বাৎসরিক হিসাব-পত্র নিখুঁতভাবে পরীক্ষা (audit) করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেন। প্রতি সৈন্যদলেও একজন করিয়া মজুমদার থাকিতেন। 'আমীন্' পদবীধারী ব্যক্তিগণ প্রজার নাম-ধাম, পেশার তালিকা, প্রয়োজনীয় দলীল-দস্তাবেজসমূহের নকল রাখিতেন ও জমা-ওয়াশীল-বাকীর একটা ফর্দ্দ তৈয়ারী করিয়া সদরে পাঠাইয়া দিতেন। হিসাবের গরমিল্ হইবার কোন জো ছিল না, কোন বিষয়ে মিতব্যয়িতার অভাব ঘটিবার উপায় ছিল না।

যুদ্ধ বা লুণ্ঠনকালে স্ত্রীলোক, বালক ও বৃদ্ধের উপর অত্যাচার করা শিবাজীর নিষেধ ছিল। গো-মহিষ ও কৃষককুল,

মারাঠা সৈন্যের উৎপীড়নের আমলে কখনও আসিত না। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে কোন সৈন্যাধ্যক্ষ দাসী বা গণিকা হিসাবে কোন স্ত্রীলোককে লইয়া গেলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইত। বিজাতীয়ের ধর্ম্মমন্দির, কবরখানা বা আশ্রমের কোন ক্ষতি সাধন করিলে সৈনিকগণ দণ্ড পাইত। লুণ্ঠনকালে কোরাণ বা শরিয়ৎ দেখিতে পাইলে, শিবাজী তাহা তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া লইয়া কপালে ঠেকাইতেন ও সশ্রদ্ধায় সেখানি কোন মুসলমান কর্ম্মচারীকে দান করিতেন। মুসলমান কর্ম্মচারীরা জুম্মার নমাজ পড়িবার জন্য শুক্রবার ছুটি পাইত। তিনি হিন্দু সন্ন্যাসী, মুসলমান ফকীরকে সমান শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং মন্দির মসজিদ উভয়ের জন্যই নিষ্কর জমি দান করিতেন। ঔরঙ্গজেবের দারুণ হিন্দু-বিদ্বেষ, মন্দির-ধ্বংস ও জিজিয়া করের পার্শ্বে শিবাজীর এই পরমত-সহিষ্ণুতা ও মহানুভবতা—একটা মনোরম অসামঞ্জস্য বটে।

পুনা-সন্নিকটস্থ রায়গড়ে শিবাজীর রাজধানী। দরবারের আটজন প্রধান অমাত্য একদিকে শিবাজীর পরামর্শদাতা, অন্য-দিকে রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের পরিচালক। রাজা বিক্র-মাদিত্যের নবরত্নের ন্যায় শিবাজীর এই 'অষ্টপ্রধানগণ' ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের সহিত সামান্য পরিচয় থাকা উচিত।

পেশ্‌ওয়া (মুখ্যপ্রধান) ছিলেন রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী। মোরেশ্বর ত্রিমল পিঙ্গলে এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পেশ্‌ওয়া যুদ্ধে গেলে, তাঁহার সহকারী বিভাগ-পরিচালন করিতেন। ইঁহার পদের নাম ছিল 'কার্‌বারী দেওয়ান্'।

প্রধান মজুমদার ছিলেন (পন্থ্ অমাৎ) আজকালকার Finance Minister ও Auditor General-এর মত। কল্যাণের সুবাদার আবাজী সন্দেও ছিলেন প্রধান মজুমদার। ইঁহারও একজন সহকারী ছিলেন।

'প্রধান শূরুনবীশ' (পন্থ্ সচিউ) ছিলেন দলীল-দস্তাবেজের রক্ষক, প্রয়োজনীয় চিঠিপত্রের ও সন্ধিপত্রের লেখক। অন্নজী দত্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইঁহার সহকর্মীর পদের নাম ছিল ফড়্নবীশ্ বা ফড়্নীশ্।

'ওয়াকিয়ানবীশ্'—মহারাজের private secreteryর মত ছিলেন। তিনি পাগাহ্ সৈন্যের তদারক করিতেন, দরবারের প্রধান ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিতেন, শিবাজীর সংসার পরিচালন করিতেন এবং ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের জবাব লিখিতেন।

প্রধান 'শর্-ই-নৌবৎ' (সেনাপতি) ছিলেন প্রথমে দুইজন। প্রতাপ রাও গুজর ছিলেন অশ্বারোহী ফৌজের সর্বময় কর্তা আর যশজী কঙ্ক ছিলেন পদাতিক সৈন্যের সর্বময় কর্তা। তারপর হাম্বীর রাও মোহিতে হইয়াছিলেন জঙ্গীলাট্ বা Commander-in-Chief.

'দবীর' (সামন্ত) ছিলেন ইংরাজ রাজ্যের Minister of Foreign Affairs-এর মত। সোমনাথ পন্থ্ ছিলেন এই পদে অধিষ্ঠিত। দবীরের সহকারীকে বলা হইত 'চিট্‌নীশ্' বা 'চিটনবীশ্'।

'ন্যায়াধীশ' ও 'পণ্ডিত রাও'দ্বয় ফৌজদারী ও দেওয়ানী

আইনকানুন প্রণয়ন ও সংশোধন করিতেন, ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেন, জ্যোতিষ ও বিজ্ঞানের তত্ত্ব প্রচার করিতেন এবং আপীলের বিচার করিতেন।...

যাহাহউক, শিবাজীর অভিষেকের এক বৎসর পরে একটা বাজে অছিলায় মুঘল-সেনাপতি দিলীর খাঁ শিবাজীর এলাকা-ভুক্ত কল্যাণ আক্রমণ করেন। এবারও শিবাজী জয়ী হইলেন। নর্ম্মদা পার হইয়া তিনি গুজরাট-সীমানার প্রধান বন্দর ব্রোচ্ আক্রমণ করিয়া উহার উপর চৌথ বসান্। তাঁহার সৈন্যেরা বুর্হানপুর হইতে মাহুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশ চষিয়া সমভূমি করিয়া ফেলে।

জিঞ্জীয়ার সিদ্দীদিগকে ও গোয়ার পর্ত্তুগীজদিগকে তাড়াইবার জন্য শিবাজী বরাবরই চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন; এবার যাহাতে সে চেষ্টা ব্যর্থ না হয়, তজ্জন্য তিনি সাতারা ও কোলাপুরে দুইটি প্রকাণ্ড দুর্গ তৈয়ারী করাইয়া, সৈন্য দিয়া ভর্ত্তি করিলেন। ফরাসী বণিকদিগের নিকট হইতে কয়েকটি কামানও ক্রয় করিলেন। কিন্তু সাতারায় সৈন্য সন্নিবেশ-কালে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং তাঁহার শরীর চিরকালের জন্য ভাঙ্গিয়া যায়। তারপর ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি কর্ণাট-বিজয়ে বাহির হইবেন স্থির করিলেন। তজ্জন্য ৩০,০০০ অশ্বারোহী ও ৪০,০০০ পদাতিক সজ্জিত হইল।

কর্ণাটের অধিকাংশ তখন বিজাপুরের অধীন এবং বিজাপুর মুঘলের অনুগত। সুতরাং এই দুই শক্তির মুখে পুরাপুরি

লাগাম কষিয়া রাখিতে গেলে, আর একটা রাজ্যের সাহায্য আবশ্যক। সুতরাং তিনি দলবলসহ গোলকুণ্ডার তখনকার রাজধানী হায়দ্রাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সৈন্যের বহর দেখিয়া কুতবশাহী সুলতান্ ও তাঁহার দুই মারাঠী মন্ত্রী ত বেজায় ভড়্কাইয়া গেলেন। তাঁহারা খুশী হইয়া শিবাজীর সহিত এক নূতন সন্ধি করিলেন। কথা থাকিল, মুঘল বা বিজাপুরের বেয়াড়া চাল দেখিলেই তাঁহারা যুদ্ধ করিবেন; তারপর কর্ণাট্ জয় হইলে গোলকুণ্ডা তাহার একটা অংশ পুরস্কার পাইবেন।

হায়দ্রাবাদ হইতে শিবাজীর প্রকাণ্ড বাহিনী দক্ষিণে অগ্রসর হইল। তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণার সঙ্গমস্থলে নদী পার হইয়া, তাঁহারা কর্ণাট রাজ্যের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বঘাটের কোল দিয়া ক্রমশঃ তাহারা কাডাপ্পা অভিমুখে চলিল। তারপর একে একে জিঞ্জী ও তৃণমল্লী সুবা তাহাদের হস্তগত হইল। ভেলোরের প্রসিদ্ধ দুর্গেরও পতন হইল। তারপর শিবাজী তাঞ্জোরের দিকে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত হইলেন।

ইতঃপূর্ব্বে শাহজী বর্ত্তমান মহীশূর রাজ্যভুক্ত কোলার, বাঙ্গালোর, এবং মাদ্রাজ প্রদেশের আর্ণ্‌কোট্, বালাপুর, সেরা ও তাঞ্জোর জেলার বেশীর ভাগই জায়গীর রূপে পাইয়াছিলেন। এইগুলি এক করিলে সত্যই একটি ছোটখাট রাজ্য হয়। ইহার সমস্ত উপসত্ত্বই এতদিন শিবাজীর সৎভাই বঙ্কজী ভোগ করিতে-

ছিলেন। এখন শিবাজী ইহার ছায্য অর্দ্ধাংশ মোলায়েমভাবে দাবী করাতে বঙ্কজী তাহা দিতে অস্বীকার করিলেন। তখন রক্ত চক্ষুতে ফল ফলিল। বঙ্কজী অর্দ্ধেক অংশ ছাড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু কয়েক মাস পরে সুযোগ পাইয়া শিবাজীর সুবাদারকে সসৈন্যে আক্রমণ করিলেন। তাহা হইলেও, শিবাজীর ভ্রাতৃস্নেহের অমোঘ ক্ষমাশীলতায় বঙ্কজী শেষটায় তাঁহার বিশেষ অনুগত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

যাহা হউক, ইহার পর শিবাজীর বর্গীর সৈন্যদল কর্ণাটের বড় বড় শহর, বন্দর ও গঞ্জের উপর চৌথ বসাইল, নতুবা যথাসর্ব্বস্ব লুট করিয়া উজাড় করিয়া ফেলিল। বিজাপুরের সুবাদার, কেল্লাদার ও করদ-রাজারা তাহাদের নিকট তৃণবৎ উড়িয়া গেল।

বিজাপুর ও মুঘলদের গতিক সুবিধার নহে জানিতে পারিয়া, কর্ণাট জয় অসম্পূর্ণ রাখিয়াই শিবাজীকে মহারাষ্ট্রে ফিরিতে হইল। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে আর একবার দিলীর খাঁর সহিত শিবাজীকে লড়িতে হইয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত শিবাজীই জয়ী হইয়াছিলেন এবং ঔরঙ্গাবাদ নগর নিঙড়াইয়া তাহার সমস্ত ধনসম্পদ বাহির করিয়া লইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, বিজাপুর ও ভূতপূর্ব্ব আহ্‌মেদনগর রাজ্যের কয়েকটি প্রধান প্রধান স্থান ও দুর্গ নিজ অধিকার-ভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

সারাজীবন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া, আদর্শ হিন্দু-

রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করিয়া, এই অনন্তকর্ম্মা দেবচরিত্র মহিমময় বীর ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ৫৩ বৎসর বয়সে সাতদিনের বাতজ্বরে মহাপ্রয়াণ করেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শিবাজীর বংশধরগণ

যে শিবাজীকে বিদেশী ঐতিহাসিকগণ নেপোলিয়ান্, সীজার বা আলেকজান্দারের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তুলনা করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, সেই মহাশক্তিমান্ লোক-পালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই জাতির স্বাধীনতার মাটিতে সকলের অলক্ষ্যে একটি গৃহ-বিবাদের বীজ আসিয়া ঠিকরিয়া পড়িল।

শিবাজীর চারি বিবাহ। তন্মধ্যে সইবাঈয়ের সহিত আমরা পূর্ব্বেই পরিচিত হইয়াছি। শিবাজীর জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভুজী (শম্ভাজী) সইবাঈয়ের গর্ভজাত। শিবাজীর দ্বিতীয়া পত্নী সয়েরাবাঈয়ের আর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম রাজারাম—তিনি শম্ভুজীর প্রায় বারো বৎসরের ছোট ছিলেন।

কিশোর বয়স হইতেই তিনি অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ও হিংস্র



শেষ পেশ্‌ওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও।



ঔরঙ্গজেব।

[মহারাষ্ট্র]

প্রকৃতির ছিলেন। পিতা ক্রমাগত তিরস্কার করিয়া অথবা মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া তাঁহাকে দোরস্ত করিতে পারেন নাই। অসৎ সংসর্গে পড়িয়া তিনি মদ্যপান করিতে ও অন্যান্য পাপ-কার্য্য করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। পিতা একবার তাঁহাকে কড়া শাসন করিলে, তিনি ঔরঙ্গাবাদে গিয়া দিলীর খাঁর সহিত যোগ দেন্ এবং মুসলমানের সাহায্য লইয়া পিতাকে শাস্তি দিবেন বলিয়া শাসাইতে থাকেন। বহুকষ্টে শিবাজী এই কুলাঙ্গার পুত্রকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া, পানাল্লা দুর্গে নজরবন্দী করিয়া রাখেন। শিবাজীর মৃত্যুর সময়ও তিনি পানাল্লায়। অমাত্যগণ তাঁহার দশবৎসর বয়স্ক সৎভাই রাজারামকে সিংহাসনে বসাইবার মতলব আঁটিতেছেন, এমন সময় কোনক্রমে মুক্তি পাইয়া শম্ভুজী রায়গড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পিতার মুকুট একপ্রকার জোর করিয়াই নিজের মাথায় পরিলেন।

কিন্তু তিনি পিতার আসনে বসিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। রাজ্যশাসন ও সৈন্য পরিচালনের সমস্ত ভার পেশ্ওয়া মোরো পন্থের হাতে দিয়া তিনি সর্ব্বদা পানাহার ও স্বচ্ছ আমোদেই মত্ত থাকিতেন। রাজা হইয়া তাঁহার নিষ্ঠুরতা চরমে উঠিল। তিনি রাজারামকে বন্দী করিলেন, তাহার মাতা সয়েরাবাঈকে অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিলেন এবং রাজারামের দলস্থ কর্ম্মচারীদিগকে একযোগে বন্দী বা হত্যা করিলেন। পন্থসচিব অন্নজী দত্ত, শিবাজীর অকৃত্রিম সেবক চিৎনবীশ বালাজী আউজী প্রমুখ বহুলোক ঘাতকের খড়্গ-তলে

প্রাণ দিল। পরে পেশ্ওয়া মোরো পন্থকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল: তাঁহার পরিবর্ত্তে কুলূশা নামক এক কণৌজী ব্রাহ্মণ—শম্ভুজীর প্রাণের ইয়ার, পেশ্ওয়ার দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করিল।

রাজত্বের কয়েক বৎসর অত্যাচার ও বৃথা আমোদে কাটাইয়া, শম্ভুজীর আত্মসম্মান-বোধ ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল, বীরের শোণিত তাঁহার সুপ্ত বিবেককে নাড়া দিয়া কতকটা জাগাইয়া তুলিল। তিনি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিলেন। মুঘলগণ কঙ্কনে যুদ্ধাভিযান করিলে, তিনি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। তারপর ভীমবেগে জিঞ্জীরা আক্রমণ করিলেন। ওদিকে বহু গ্রাম পোড়াইয়া ও গ্রামবাসীকে বলপূর্ব্বক খৃষ্টান করিয়া পর্ত্তুগীজগণ পোণ্ডা অবরোধ করিলে, তিনি ভীষণ আক্রোশে তাহাদিগকে আক্রমণ করেন এবং স্থলযুদ্ধে ও জলযুদ্ধে তাহাদিগের শিরদাঁড়া ভাঙ্গিয়া দেন্।

অবশেষে ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব স্বয়ং বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও মহারাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে মুঘলের পদানত করিতে দিল্লী হইতে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সহিত নানা জাতীয় পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলোন্দাজ সৈন্য পিপীলিকার সারির মত চলিতে লাগিল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বুর্হান্পুর ও আহমেদনগর হইয়া, মদগর্ব্বী মুঘল সম্রাট্ ঔরঙ্গাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার পর প্রায় এক সঙ্গেই এই তিন রাজ্য আক্রান্ত হইল। ঔরঙ্গজীবের রাগ সব চেয়ে বেশী মহারাষ্ট্রের

উপর ; একে হিন্দুরাজ্য—তায় বিদ্রোহী বাদশাহ-পুত্র মুহাম্মদ আকবর শম্ভুজীর নিকট আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। যুদ্ধে একবার মুঘল পক্ষ হারেন, একবার মহারাষ্ট্র পক্ষ হারেন। একবার শম্ভুজীর সৈন্যদল বৃদ্ধ সেনাপতি হাম্বীর রাওয়ের নেতৃত্বে ব্রোচ্ হইতে বুর্হানপুর পর্য্যন্ত শত শত মাইল ভূভাগ লুণ্ঠন করিয়া, জ্বালাইয়া দিল। আবার মুঘল্‌রা কঙ্কনের কতকগুলি নগর দখল করিয়া, অমুসলমান প্রজাদের উপর জিজিয়া নামক অতিরিক্ত কর জোর করিয়া আদায় করিতে লাগিলেন।

ইতোমধ্যে ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর এবং ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে গোল্‌কুণ্ডা রাজ্য বাদ্‌শাহ্ ঔরঙ্গজেবের খাস্‌দখলে আসিল ; দাক্ষিণাত্যে পাঠান রাজত্বের শেষ চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত লোপ পাইল। তারপর ঔরঙ্গজেবের দিগ্বিজয়ের তোড়জোড় ও কৃতকার্য্যতার প্রথম পরিচয় পাইয়া কোন কোন মহারাষ্ট্র মন্‌সব্‌দার সম্রাটের দলে গিয়া চাকুরী লইল ; কোন কোন সুবেদার আবার তলে তলে ঔরঙ্গজেবের পক্ষপাতী হইয়া পড়িল। ইহার আর একটা প্রধান কারণ ছিল ; শম্ভুজীর না ছিল ব্যক্তিত্বের প্রভাব, না ছিল রাজ্যশাসনে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অধ্যবসায়। তাহা ছাড়া, অপদার্থ কুলুশার পেশ্‌ওয়াগিরিতে অনেকেই স্বাধীনতা-রক্ষার আশায় জলাঞ্জলি দিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে কোলাপুরের নিকটে সঙ্গমেশ্বর নামক স্থানে শম্ভুজী তাঁহার পেশ্‌ওয়া ও চব্বিশজন অনুচর সহ হঠাৎ মুঘলের হাতে ধরা পড়িলেন। ঔরঙ্গজেব তখন পুনার বোমো

মাইল উত্তরপূর্ব্বে তোলাপুরের ছাউনীতে অবস্থান করিতেছিলেন। বন্দীগণকে সেখানে আনিয়া কয়েদ করা হইল। ঔরঙ্গজেব শম্ভুজীকে জানাইলেন, "তুমি এখন আমার বন্দী, তোমার প্রাণ এখন আমার করায়ত্ত। তুমি যদি সদলে পবিত্র ইস্‌লাম্ ধর্ম্ম গ্রহণ কর, তাহা হইলে মুক্তি পাইবে; নচেৎ কঠিন মৃত্যু তোমার নিশ্চিত।"

শম্ভুজী জানাইলেন "বেয়াদব ধর্ম্মান্ধ বাদশাহ্, তোমার কন্যার সহিত যদি আমার বিবাহ দাও, তাহা হইলে আমি ইস্‌লাম গ্রহণ করার কথা ভাবিয়া দেখিতে পারি।" তারপর মহাপুরুষ হজরৎ মুহাম্মদকে জঘন্য ভাষায় গালি পাড়িলেন।

ঔরঙ্গজেব ক্রোধে দাবাগ্নির মত জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার আদেশে তৎক্ষণাৎ প্রকাশ্য বাজারের ভিতর ঘাতকেরা হস্তপদবদ্ধ শম্ভুজীর চক্ষুদ্বয় তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা উপ্‌ড়াইয়া ফেলিল; তারপর তাঁহার জিহ্বা টানিয়া ছিঁড়িয়া নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিল!

রাজারাম এতদিন বন্দী অবস্থায় রায়গড়ে ছিলেন। শম্ভুজীর ছয় বৎসরের পুত্র দ্বিতীয় শিবাজী বা সাহুকে সিংহাসনে বসাইয়া, রাজরামকে তাঁহার অভিভাবক ও রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। যাঁহারা এতদিন শম্ভুজীর স্বাভাবিক মৃত্যু চাহিতেছিলেন, তাঁহারাও মুঘলের হাতে তাঁহার এই নৃশংস হত্যার সংবাদে অশ্রু মোচন করিয়া, উহার প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

মহারাষ্ট্র দলপতিগণ সম্মিলিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিবার সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্দ্দিক দিক হইতে মুঘলগণ তাঁহাদের ঝাঁকিয়া ধরিল। রাজারাম বিশালগড় দুর্গ পরিদর্শনে গিয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ একদল মুঘল আসিয়া রায়গড়ে হানা দিল। শম্ভুজীর বিধবা পত্নী ও বালক শিবাজী বন্দী হইয়া ঔরঙ্গজেবের নিকট নীত হইলেন। ঔরঙ্গজেবের কন্যা শম্ভুজীর পত্নীর সহিত বেশ ভাব জমাইয়া লইলেন। শিবাজীর ওই শিশু পৌত্রটিকে দেখিয়াই বৃদ্ধ মুঘল সম্রাটের কেমন মমতা জন্মিল। তিনি তাহার 'সাহু' নাম দিয়া, তাহাকে সস্নেহে নিজের কাছে রাখিয়া দিলেন।

রাজারাম বিপন্ন মহারাষ্ট্রের ভার রামচন্দ্র পন্থ বাওরীকার ও প্রধান সেনাপতি মহাদেওজী নায়কের হস্তে দিয়া, অন্যান্য অমাত্য, কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর ও একদল সৈন্য সমেত সুদূর কর্ণাটে পলাইয়া গেলেন এবং জিঞ্জীতে গিয়া নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সেখানে গিয়াও নিস্তার নাই। অচিরে জিঞ্জী মুঘল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল এবং কয়েক বৎসরের নানা বিপর্য্যয়ের পর অধিকৃত হইল। কিন্তু রাজারাম তাঁহার দলবল সহ পলায়ন করিলেন। ইতোমধ্যে মহারাষ্ট্রে মুঘলরা অনেকগুলি দুর্গ দখল করিয়াছিল এবং অনেক-গুলি সুবা হস্তগত করিয়াছিল; পুনা জেলার ত্রিসীমানায় আর মারাঠা স্বাধীনতার চিহ্নমাত্র রহিল না। এই সময়ে সেনাপতি মহাদেওজী নায়কের মৃত্যুতে মহারাষ্ট্রীয়গণ আরও হতাশ হইয়া পড়িল।

কিন্তু রামচন্দ্র পন্থ এই সঙ্কটকালে বিচ্ছিন্নপ্রায় মহারাষ্ট্র সর্দারদের এক করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন। তিনি সাতারায় তাঁহার কেন্দ্র স্থাপন করিয়া, মারাঠি সৈন্যদিগকে সংহত করিতে লাগিলেন। তারপর কয়েকটি মুঘল ঘাঁটি আক্রমণ করিয়া যাহা কিছু ধনরত্ন পাইলেন, সেগুলি সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করিয়া তাহাদের উৎসাহ সঞ্জীবিত করিয়া রাখিলেন। এমন সময় গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের মহারাষ্ট্র সেনাদলের নেতৃদ্বয় শান্তাজী ঘোড়্‌পোড়ে ও ধান্নাজী যাদব তাঁহাদের নিষ্কর্মা সৈন্যদল সমেত আসিয়া রামচন্দ্রের সহিত যোগ দিলেন। মহারাষ্ট্র দলে আবার উদ্দীপনার স্রোত বহিতে লাগিল।

মেরীচ্, বার্সি, কোলাপুর, পানাল্লা, রায়গড় প্রভৃতি স্থানে আবার মহারাষ্ট্রের গৈরিক পতাকা উড়িল; আবার চতুর্দিক হইতে ঔরঙ্গজীব নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিলেন। এমন সময় জিঞ্জী হইতে রাজারাম বিশালগড়ে ফিরিয়া আসিলেন। রামচন্দ্র পন্থের পরামর্শে রাজারাম তাঁহার রাজধানী সাতারায় স্থানান্তরিত করিলেন। এই সময় ত্রিবাঙ্কুর হইতে বম্বাই পর্য্যন্ত সমস্ত উপকূল ভাগ মহারাষ্ট্র নৌবহরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। পর্ত্তুগীজ, দিনেমার, ইংরাজ, ফরাসী ও জিঞ্জীরার সিদ্দীদের জাহাজে দিনে-দুপুরে মারাঠি বোম্বেটেরা রাহাজানি করিতে লাগিল। সমুদ্র তীরবর্ত্তী বহু দুর্গ তাহাদের হস্তগত হইল। বোম্বাইয়ের নিকট কোলাবায় শিবাজী একটা নৌবহরের আড্ডা স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন ; এখন উহাকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ

ও সুরক্ষিত করা হইল। বোম্বাইয়ের ইংরাজরা এই ব্যাপারে একটু ভীত হইয়া পড়িলেন।

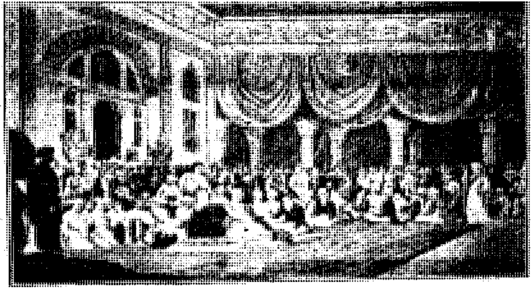
১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে রাজারাম কয়েকজন দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতি লইয়া উত্তর কঙ্কনের বহুস্থান জয় করিয়া লইলেন; খান্দেশ, বেরার, বাগলানা ও গঙ্গাথুরি আক্রমণ করিয়া চৌথ ও সর্দেশমুখী কর স্থাপন করিলেন। যে সকল মুঘল ফৌজদার প্রতিরোধের চেষ্টা করিলেন, তাহাদিগকে নির্দ্দয়ভাবে কাটিয়া ফেলা হইল। যাহারা পুরা বা আংশিক ভাবেও চৌথ দিতে পারিল না, তাহারা কিস্তিবন্দী খৎ লিখিয়া দিল। এই সকল চৌথ কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করিবার জন্য, রাজারাম সর্ব্বপ্রথম ঐ সকল দেশে এক একটা ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, এক একজন ওস্তাদ সেনাপতির অধীনে এক দল করিয়া বর্গীর সৈন্য রাখিয়া আসিলেন।

এদিকে ঔরঙ্গজেব, পুত্র আজিম সাহ্‌কে লইয়া সাতারা-দুর্গ আক্রমণ করিলেন (১৭০০ খৃঃ অঃ)। কয়েক মাস অবরোধ ও যুদ্ধের পরে মারাঠা সৈন্যরা, দুর্গ হইতে বাহির হইয়া, মুঘল ব্যূহ ভেদ করিয়া চলিয়া গেল; শূন্য দুর্গ সম্রাটের হস্তগত হইল। এই সময় রাজারাম মরণাপন্ন হইয়া উত্তরাপথ-অভিযান হইতে সিংহগড়ে ফিরিয়া আসিলেন। রাজারামের মৃত্যুর পর তাঁহার দশ বৎসরের ছেলে তৃতীয় শিবাজী মহারাষ্ট্রের গদীতে বসিলেন; তাঁহার বীরমাতা তারাবাঈ মোহিতে অভিভাবক হইলেন।

কোন পরাজয়ই মহারাষ্ট্রদের উৎসাহ ম্লান করিতে পারিল

না। নানা দলে বিভক্ত হইয়া তাহারা মুঘল অধিকারে উৎপাত আরম্ভ করিল। বারবার ঔরঙ্গজেবের তোষাখানা লুট হইল। পান্হাল্লা, বসন্তগড়, পবনগড়, সাতারা প্রভৃতি আবার তাহারা হস্তগত করিল। টাকার শ্রাদ্ধ হইতে লাগিল, অথচ এই পার্বত্য মুষিকদের জব্দ করা গেল না। ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে তাহারা নর্মদা নদী পার হইয়া, মালব ও গুজরাট আক্রমণ করিয়া, চৌথ ও সরদেশমুখী কর আদায় করিল। ফিরিবার পথে পুনরায় বুর্হানপুর, বেরার ও খান্দেশ লুট করিল। হাজার হাজার গ্রাম, শত শত মুঘল ছাউনী পুড়াইয়া ভস্মসাৎ করিয়া দিল। কুড়ি বৎসরের উপর দাক্ষিণাত্যে থাকিয়া ঔরঙ্গজেব অধীর হইয়া পড়িলেন। ওদিকে দিল্লীতে তাঁহার প্রাণ পড়িয়া আছে, এদিকে জীবন-প্রদীপও নিবু-নিবু হইয়া আসিয়াছে। ১৭০৭ সালে ঔরঙ্গজেব আহ্মেদনগরে প্রাণত্যাগ করিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর সাহু মুক্তি পাইয়া মহারাষ্ট্রে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সিংহাসনের দাবী তারাবাঈ উড়াইয়া দিলেও সাহু জোর করিয়া সাতারায় আসিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন (১৭০৮)। মহারাষ্ট্র দলপতিদের মধ্যে ঘরোয়া বিবাদের সূত্রপাত হইল। কিন্তু প্রতাপান্বিত সেনাপতি ধান্নাজী যাদব সাহুর পক্ষে যোগ দেওয়ায়, তারাবাঈয়ের পক্ষ দুর্বল হইয়া পড়িল। তারপর তারাবাঈয়ের পুত্র তৃতীয় শিবাজী বসন্ত রোগে মারা গেলে, সকলে মনে করিল—বুঝি এইবার ঘরোয়া বিবাদের ইতি হইল। কিন্তু রামচন্দ্র পন্থ কোলাপুরে



পুনা দরবার

একটা নূতন রাজ্যপাট সৃষ্টি করিয়া, রাজারামের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত পুত্রকে দ্বিতীয় শম্ভুজী নাম দিয়া, মহারাষ্ট্রের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। দাক্ষিণাত্যের মুঘল শাসন-কর্তা চিন্‌কুলীচ খাঁ নিজাম্-উল্-মুল্ক দ্বিতীয় শম্ভুজীর দাবী স্বীকার করিয়া মহারাষ্ট্রের দলাদলির আগুন ভালো করিয়া খুঁচাইয়া তুলিলেন।

সেনাপতি ধান্নাজীর এক ব্রাহ্মণ কারকুন্ ছিলেন—তাঁহার নাম বালাজী বিশ্বনাথ ভাট্। একটা বিরাট প্রতিভা তাঁহার মধ্যে লুকাইয়া ছিল। দুর্ব্বল সাহুকে পরিত্যাগ করিয়া যখন প্রধানগণ কোলাপুরের পক্ষে যোগদান করিতে লাগিলেন, তখন এই কারকুন তাঁহাকে সৎ পরামর্শ দিয়া আশান্বিত করিয়া তুলিলেন। ইঁহারই কর্ম্মকুশলতায় সাহুর পক্ষ ক্রমশঃ বলবত্তর হইয়া উঠিল এবং মারাঠা-শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। কিছুদিন পরে বালাজী বিশ্বনাথ পেশ্‌ওয়া পদে নিযুক্ত হইলেন এবং ক্রমশঃ সাহুর ব্যক্তিত্ব গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। সাহু বিলাসপ্রিয় ও শান্তিকামী ছিলেন। তিনি গান-বাজনা, তাস-পাশা এবং মৎস্য ও পশু-শীকারেই সময় অতিবাহিত করিতেন। প্রকৃতপক্ষে রাজত্ব করিতে লাগিলেন বালাজী বিশ্বনাথ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পেশ্‌ওয়া-শাসন

প্রথম পেশ্‌ওয়া—বালাজী বিশ্বনাথ

ফেরোক্‌সায়ার তখন দিল্লীর সম্রাট। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছিলেন সৈয়দ বংশীয় দুই ভ্রাতা—উজীর আব্‌দুল্লা খাঁ ও সেনাপতি হোসেন আলি খাঁ। হোসেন আলি মারাঠাদিগকে দমন করিবার জন্য দাক্ষিণাত্যে আসিলেন, কিন্তু ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। ফেরোক্‌সায়ার হোসেন আলিকে ভয় করিতেন ও তাঁহার কর্তৃত্বকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি গোপনে মহারাষ্ট্রীদিগকে হোসেন আলির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিলেন।

পেশ্‌ওয়ে বালাজী বিশ্বনাথ এখন মহারাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্ত্তা; তিনি শঙ্করজী মলহরের সহায়তায় হোসেন আলিকে এক সুবিধাজনক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে রাজী করাইলেন। ইহার দ্বারা সাহু দাক্ষিণাত্যের ছয়টি বড় বড় সুবা হইতে চৌথ ও সর্দেশমুখী কর আদায় করিতে পারিবেন, এবং শিবাজী পূর্ব্বে যে সমস্ত দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা স্বরাজ্য বলিয়া

ফেরৎ পাইবেন। সাহু ইহার পরিবর্ত্তে মুঘল সরকারে দশ লক্ষ টাকা কর দিবেন এবং পনের হাজার মারাঠা সৈন্য দিবেন। কিন্তু ফেরোকসায়ার এ সন্ধিপত্র নামঞ্জুর করায় হোসেন আলি অপদস্থ হইয়া পড়িলেন। তারপর ফেরোকশায়ারের গুপ্ত অভিসন্ধি টের পাইয়া, এক দল মারাঠা সৈন্য ভাড়া করিয়া লইয়া তিনি দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সৈন্যদলের কর্ত্তা হইয়া চলিলেন পেশ্ওয়া বালাজী বিশ্বনাথ ও খণ্ডে রাও দাবাড়ে।

ফরোক্সায়ারের দলবল পরাজিত ও সম্রাট নিহত হইলেন। মহারাষ্ট্র সৈন্যদের সহায়তায় সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয় আবার রাজধানীর কর্তৃত্ব লাভ করিয়া, ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে সুলতান মুয়াজ্জামের পৌত্র মোহাম্মদ শাহ্‌কে দিল্লীর তক্ত-তাউসে বসাইয়া দিলেন। বালাজী বিশ্বনাথের চেষ্টায় মোহাম্মদ শাহ পূর্ব্ব সন্ধিপত্রে গ্রহীতা হিসাবে স্বাক্ষর করিলেন। বিজয় গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া পেশ্ওয়া সাতারায় ফিরিয়া আসিলেন (১৭২০ খৃঃ অঃ)। এখন মারাঠাগণ ভারতের প্রায় এক দশমাংশের মূল মালিক ও প্রায় এক তৃতীয়াংশের চৌথ-সর্দেশমুখীর অধিকারী। এজন্য বালাজীর যথেষ্ট বিদ্যাবুদ্ধি খরচ করিতে হইল; তিনি নূতন নূতন কর্ম্মচারী-দিগকে বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়া ঔরঙ্গাবাদ, বেরার, বিদর, বিজাপুর, হায়দ্রাবাদ (গোলকুণ্ডা), খান্দেশ—এই ছয়টি সুবায় পাঠাইয়া দিলেন। এখন হইতে শিবাজীর বংশধরগণ কেবল 'সনদ' করিবার জন্য নিযুক্ত রহিলেন। তাঁহাদের সমস্ত ক্ষমতা পেশ্ওয়াদের হাতে চলিয়া গেল। ওদিকে দ্বিতীয় শম্ভুজী ও

তাঁহার বংশধরগণ রাজা নামে একটা বড় রকমের জমিদার হইয়া কোলাপুরে স্বতন্ত্র রহিলেন। ঠিক এই সময় মালবের শাসন-কর্ত্তা চিন্ কুলীচ্ খাঁ নিজাম-উল্-মুল্ক, সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়ের কর্ত্তৃত্ব তুচ্ছ করিয়া, বিদ্রোহের ধ্বজা উড়াইলেন। তিনি নর্ম্মদা পার হইয়া খান্দেশ জয় করিয়া, দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাকে কেহ রুখিতে পারিল না। তিনি বলপূর্ব্বক হোসেন আলিকে সরাইয়া, নিজেই দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হইয়া পড়িলেন। গোলকুণ্ডা ও দৌলতাবাদের বহু অংশ ক্রমশঃ গ্রাস করিয়া, তিনি অবশেষে নিজাম-উল্-মুল্ক আসফজা নামে দাক্ষিণাত্যের একটি স্বতন্ত্র রাজা হইয়া উঠিলেন। বর্ত্তমান হায়দ্রাবাদের নিজামগণ ইঁহারই বংশধর।

দ্বিতীয় পেশওয়া—প্রথম বাজীরাও

১৭২০ খৃষ্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বালাজী বাজীরাও পেশ্ওয়া পদে উপবেশন করিলেন। রাজপদের ন্যায় পেশোয়ার পদও এখন হইতে পুরুষানুক্রমে অধিকৃত হইতে লাগিল। পেশওয়া বংশে বাজীরাও যে সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। শিবাজী যে জাতিকে একতা-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, বাজীরাও সেই জাতির মধ্যে শক্তি ও শৃঙ্খলার সঞ্চার করিয়া, ভারতের সর্ব্বত্র তাহাদিগকে জয়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন।

এই সময় ত্র্যম্বক রাও ধাবাড়ে মহারাষ্ট্রের প্রধান সেনাপতি; তাঁহার সহকারী সেনাপতি হইলেন পিলাজী গায়কওয়াড়্। বুর্হানপুরের মুঘল সুবাদারকে ক্রমাগত পরাজিত করিয়া আরও দুইজন সেনাধ্যক্ষ পেশ্ওয়ার সুনজরে পড়িলেন; ইঁহাদের নাম মল্হরজী হোল্কার ও রণজী সিন্ধিয়া। মল্হর ছিলেন এক ধাঙ্গড়ের ছেলে; তাঁহার পিতা আপন বুদ্ধিবলে 'হোল্' নামক নিজ গ্রামের চৌগলা (অর্থাৎ পাটেলের সহকারী) হইয়াছিলেন। তারপর তিনি রাজা সাহুর এক সেনাধ্যক্ষের অশ্বরক্ষক হইয়াছিলেন। মল্হরজী ক্রমশঃ একজন শিলীদার হইতে ঘোড়সওয়ারদলের মন্সব্দার হইয়াছিলেন।

সাতারার পনেরো মাইল পূর্ব্বে কুন্নীরথয়ের নামক গ্রামে সিন্ধিয়াদের আদিবাস; ইহারা বাহ্মনী সুলতানদের সময় হইতে পুরুষানুক্রমে শিলীদারি করিয়া আসিতেছিল। রণজী সিন্ধিয়া ছিলেন বাজীরাওয়ের ব্যক্তিগত পাগাহ্ সৈন্যদলের একজন সামান্য বর্গীর। প্রথমে তিনি বাজীরাওয়ের চটিজুতা বহন করিতেন; তারপর প্রভুকে সন্তুষ্ট করিয়া ক্রমশঃ পাগাহ্দলের একজন মনসবদার হইয়া উঠিয়াছিলেন। মনসবদার কাহ্নজী ভোঁস্লেও এই সময় বাজী রাওয়ের নিকট আপন গুণবত্তার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন।

এই সকল বিশ্বাসী ও রণনিপুণ সেনাপতিদের পার্শ্বে পাইয়া বাজীরাও রাজা সাহুকে বলিলেন, "বিদেশীকে হিন্দুরাজ্য হ'তে উচ্ছেদ করবার এই উপযুক্ত সময়। আদেশ দিন, আমরা শুরু

বুকষুগে প্রাণপণে মুষ্ঠ্যাঘাত করি। বুক ধরাশায়ী হ'লে, তার শাখা-প্রশাখাও আপনি ধসে' পড়বে।"

শাহু সন্তুষ্ট হইলেন; পেশ্‌ওয়াকে বলিলেন, "আপনি আপনার পিতার উপযুক্ত পুত্র বটে। হিমালয় পর্য্যন্ত দেশ জয় করে', আপনি মারাঠার বিজয় পতাকা সগর্ব্বে উড়িয়ে দিন্। আমার কোন আপত্তি নাই।"

বাজীরাও ক্রমাগত পনেরো বৎসরকাল ভারতের বিভিন্ন অংশে মুঘল ও তাহার মিত্রশক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি খান্দেশ পুনরধিকার ও মালব বিজয় করিয়া চৌথ ও সর্দ্দেশমুখী কর আদায় করিয়াছিলেন। মালবের কর আদায়ের ভার দেওয়া হইয়াছিল মল্‌হর রাও হোল্‌কার ও রণজী সিন্ধিয়ার উপর।

নিজাম-উল্-মুল্ক আসফ্‌জা তখন মুঘলদের কাব্ করিয়া, গোলকুণ্ডা রাজ্যের খানিকটা গ্রাস করিয়াছেন। তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগকে ঐ অংশের চৌথ ও সর্দ্দেশমুখী দিতে চাহিলেন না। ইহার ফলে যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে নিজাম পরাজিত হন্ এবং বাজীরাওয়ের লিখিত সন্ধির খশ্‌ড়ায় সহি করিতে বাধ্য হন্।

গুজরাটের শাসন-কর্ত্তা সুর বুলন্দ খাঁ, বাজীরাওয়ের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, সুরাট বন্দর বাদে সমগ্র দেশের চৌথ ও সর্দ্দেশমুখীর আদায়ের অধিকার মহারাষ্ট্রদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। গুজরাটের কর আদায় করিবার জন্য সেনাপতি

ত্র্যম্বক রাও-ধাবাড়ের উপর রক্ষিত অর্পণ করা হইল; এবং তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্ত পিলাজী গায়কওয়াড় ও কাঁজুজী কদম নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু নিজাম-উল্-মুল্কের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া সেনাপতি তাঁহার দলবল সহ বিদ্রোহ করিলেন। বালাজী তৎক্ষণাৎ এই বিদ্রোহ-দমনে কৃতকার্য্য হইলেন। ত্র্যম্বক রাও যুদ্ধে প্রাণ দিলেন।

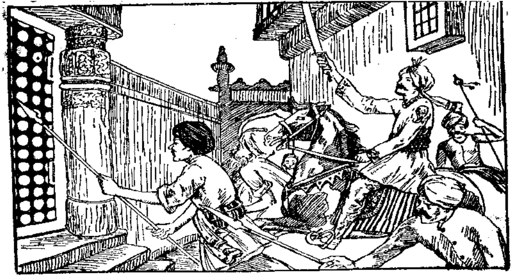
কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি পেশ্‌ওয়া বিদ্রোহীদের কোন শাস্তি দিলেন না। বরং ত্র্যম্বকের নাবালক পুত্র যশোবন্ত রাও ধাবাড়েকে গুজরাটের শাসন ও রাজস্ব আদায়ের সম্পূর্ণ ভার ছাড়িয়া দিলেন; তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্ত পিলাজী গায়কওয়াড় 'সেনা খাস্ খেয়াল্' উপাধি পাইয়া পূর্ব্বপদে বাহাল হইলেন। কথা থাকিল, সমস্ত রাজস্ব আদায় করিয়া, অর্দ্ধেক পেশ্‌ওয়াকে পাঠাইয়া দিতে হইবে; বাকী অর্দ্ধেক তাঁহারা খুশীমত খরচ করিবার স্বাধীনতা পাইলেন। কিছুদিন পরে আহ্‌মেদাবাদের সুবাদার অভি সিংহ পিলাজীকে হত্যা করিয়া, বরোদা-দুর্গ দখল করিলে, তাঁহার ভ্রাতা মাধোজী গায়কওয়াড় ও পুত্র দুম্বাজী গায়কওয়াড় একদল সৈন্ত লইয়া সমগ্র বরোদা জেলা ত দখল করিলেনই, তা' ছাড়া জম্বুশহর, আহ্‌মেদাবাদ প্রভৃতি পদানত করিয়া ও রাজপুতানার কিছু দূর পর্য্যন্ত দখল করিয়া, মারাঠা-বীর্য্যের পরিচয় দিয়া আসিলেন।

কাহ্নজী ভোঁস্‌লেকে পেশ্‌ওয়া বাজীরাও বেরারের সুবেদার ও সেনাপতি করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অবাধ্যতা প্রকাশ

করায়, তাঁহাকে বন্দী করিয়া, তাঁহার ভাইপো রঘুজী ভোঁসলেকে বেরারের শাসন-কর্তা-পদে নিযুক্ত করা হইল। সাহুর এক শ্যালিকার সহিত রঘুজীর বিবাহ হইয়াছিল। পেশ্‌ওয়ার নিকট রঘুজী এই একরার করিয়া গেলেন যে, তিনি সাতারা সরকারে আদায়ী রাজস্বের অর্দ্ধেক নিয়মিত পাঠাইয়া দিবেন, তাহা ছাড়া বাৎসরিক নয় লক্ষ টাকা পৃথক কর দিবেন।

শিবাজী জিঞ্জীরার সিদ্দী সুলতানদিগকে বশে আনিতে পারেন নাই। কিন্তু পেশ্‌ওয়া বাজীর কৌশলে জিঞ্জীরা অবরুদ্ধ হইয়া, তাঁহার নিকট মাথা নত করিল। সিদ্দীরা সন্ধিবলে এগারটি মহলের বাৎসরিক অর্দ্ধেক খাজনার দাবী এবং টালা, উচিত-গড়, গোশালা প্রভৃতি কয়েকটি দুর্গ মহারাষ্ট্রীয়দের হাতে ছাড়িয়া দিলেন। ইহার পর মারাঠারা বোম্বাই নগরের নিকটস্থ থানা, সল্‌সিট্‌ ও বেসিন দ্বীপ হইতে পার্ত্তুগীজদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। আরব্য উপসাগরে মহারাষ্ট্রদের উৎপাত সমান ভাবেই চলিতেছিল। ইহাদের হাতে ইংরাজদের জাহাজ প্রায়ই ধরা পড়িত। ইংরাজরা তখন মারাঠা জলদস্যুর নামে সত্যই থরহরি কাঁপিতেন।

নানা দিক জয় করিবার জন্য পেশ্‌ওয়াকে এক বিরাট বাহিনী পুষিতে হইয়াছিল। সেজন্য রাজ্যের খরচ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল; পেশ্‌ওয়া ব্যক্তিগতভাবেও ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি মল্হর রাও হোলকারকে নূতন নূতন রাজ্য



মলহর রাও হোল্‌কার···রাজধানী দিল্লীর প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

[মহারাষ্ট্র—১৫৩ পৃষ্ঠা]

আক্রমণ করিয়া, চৌথ ও সর্দেশমুখী কর আদায় করিতে আদেশ দিলেন। মলহররাও দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতি; যেমন সাহসী, তেমনি প্রভুভক্ত। তিনি উত্তর দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া পুরাপুরি গোয়ালিয়ার জয় করিলেন এবং আগ্রা অধিকার করিয়া, রাজধানী দিল্লীর প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্রাট্ মুহাম্মদ শাহ্ ও তাঁহার উজীর খাঁ দৌরান্ মলহর রাওকে বাধা দিবার ক্ষীণ চেষ্টা করিয়া অবশেষে নসীবের উপর হাল্ ছাড়িয়া দিলেন। হোল্‌কার দুইহাতে রাজধানীর ধনরত্ন লুটিয়া, সুবাদার ও ফৌজাদারদের নিকট হইতে চৌথ ও সর্দেশমুখীর প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া, মালবের দিকে ফিরিয়া আসিলেন। ইতঃপূর্ব্বে পেশ্‌ওয়া মুঘলদের হাত হইতে বুন্দেলখণ্ড জয় করিয়াছিলেন এবং তথাকার রাজপুত রাজাকে ফিরাইয়া দিয়া, প্রকাণ্ড ঝান্সী জেলা এনাম পাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে ঝান্সীতে একটি ছোটখাটো মহারাষ্ট্র রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল।

ইহার পর ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে বাজীরাও নিজেই দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং পথে মল্‌হর রাও হোল্‌কার ও রণজী সিন্ধিয়াকে সঙ্গে লইয়া চম্বল (যমুনা) নদী পার হইলেন। কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধের পর দিল্লীর মুঘল সেনাপতিরা হটিয়া গেলেন। মুহম্মদ শাহ্ তখন নিজাম-উল-মুল্‌ক্‌কে মালওয়া ও গুজরাটের শাসন-ভার দিবার লোভ দেখাইয়া, বাজীরাওয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে তাঁহাকে গোপনে আহ্বান করিলেন।

নিজাম-উল-মুল্‌কের প্রকাণ্ড সৈন্যদলের সহিত, দিল্লীর একদল

রাজা জয়সিংহের অধীনে রাজপুতানায় একদল সৈন্য যোগ দিল এবং বুন্দেলখণ্ডের রাজাদেরও একদল সৈন্য যোগ দিল; ফলে সৈন্যের সংখ্যা লাখ্ খানেক হইবে। বাজীরাও প্রায় আশী হাজার সৈন্য তাঁহার পতাকা-তলে সমবেত করিলেন। ইস্‌লামগড় ও ভুপালের নিকট প্রকাণ্ড যুদ্ধ হইল (১৭৩৮ খৃষ্টাব্দ)। নিজাম-উল্-মুল্ক হারিয়া গেলেন এবং মারাঠারা তাঁহার ছত্রভঙ্গ সৈন্যদল ঘেরিয়া সংহারলীলা সুরু করিয়া দিল। নিরুপায় হইয়া নিজাম শেষে স্বীকার করিলেন যে, দিল্লী-সম্রাটের নিকট হইতে নর্ম্মদা ও যমুনা নদীর মধ্যবর্ত্তী সমগ্র মধ্যভারতের রাজস্ব করিবার সনদ্ ও ৫০ লক্ষ টাকা যুদ্ধের খরচ পেশ্‌ওয়াকে আদায় করিয়া দিবেন।

ইহার পর বেরারের মারাঠা রাজ-প্রতিনিধি রঘুজী ভোঁসলের এক কাকা রণজী ভোঁসলে একদল মারাঠা সৈন্য লইয়া, অমরাবতী হইতে বাহির হইয়া, পূর্ব্বদিকে নাগপুর, গোন্দপুর, সম্বলপুর প্রভৃতি স্থান জয় করিয়া, কটক পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিলেন। রঘুজী নিজেও উত্তরে অগ্রসর হইয়া, জব্বলপুর ও বুন্দেলখণ্ড ধ্বংস করিয়া, এলাহাবাদ পর্য্যন্ত স্থান লুণ্ঠন করিয়া বহু ধনরত্ন লুঠিয়া আনিলেন। এই সকল ব্যাপারে ভোঁসলারা পেশ্‌ওয়ার অনুমতি লন্ নাই বলিয়া, বাজীরাও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।

ইহার পর পারস্য হইতে নাদির শাহ্ আসিয়া পঞ্জাবের কতকাংশ ও দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া, রাজধানীর অধিবাসীদিগকে

লুটপাট করিলেন। নিজামী মালিক যখন ফিরিয়া গেলেন, তখন মুঘলদের মেরুদণ্ড একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে। সমগ্র ভারতে মহারাষ্ট্র-শাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার এমন চমৎকার সুযোগ বোধ হয় আর আসে নাই। বাজীরাও তাহারই বিরাট উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার মৃত্যু ঘটিল (১৭৪০ খৃঃ অঃ)।

তৃতীয় পেশ্ওয়া—বালাজী বাজীরাও

(নানা সাহেব)

রঘুজী ভোঁসলের ইচ্ছা ছিল—বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর তিনি পেশ্ওয়া পদ অধিকার করিবেন; কিন্তু বৃদ্ধ রাজা সাহু বাজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বালাজী বাজীরাওকে পেশ্ওয়া করেন। রঘুজী ভোঁসলে ইহাতে বেশ একটু ক্ষুব্ধ হইলেন। কিছু দিন পরে তিনি তাঁহার দেওয়ান্ ভাস্কর পন্থকে বেরার শাসনের ভার দিয়া, সুদূর কর্ণাট-বিজয়ে চলিয়া গেলেন। এই সময় আলিবর্দি খাঁ বাঙ্গলা, বিহার ও ওড়িষ্যার নবাব। তিনি প্রথমে ছিলেন বিহারে সহকারী শাসন-কর্তা; তারপর নবাব সরফরাজ খাঁকে হত্যা করিয়া ও ওড়িষ্যার সহকারী শাসন-কর্তা মুর্শীদ কুলীকে পরাজিত করিয়া, নবাবি তক্ত অধিকার করেন।

মীর হবিব ছিলেন মুর্শীদ কুলীর দেওয়ান; তিনি ভাস্কর পন্থকে বঙ্গ-বিহার-ওড়িষ্যা লুটপাট করিতে গোপনে আমন্ত্রণ করিলেন।

ভাস্কর দেওয়ান্ ব্রাহ্মণ হইলে কি হয়—প্রকাণ্ড যোদ্ধা ; তখন মহারাষ্ট্রের চারি বর্ণের প্রত্যেকেই লড়াইয়ে পরিপক্ব ! তিনি বারো হাজার বর্গীর অর্থাৎ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বিহারের দিকে অগ্রসর হইলেন। রামগড়, পচেৎগড় প্রভৃতি লুণ্ঠন করিয়া, মহারাষ্ট্রীরা বাঙ্গলার দিকে আসিতে লাগিল। মীর হবিব ভাস্করের দলে যোগ দিলেন। আলিবর্দ্দি মারাঠার এই বন্যার স্রোত রুদ্ধ করিতে আসিয়া হটিয়া গেলেন। ভাস্কর পন্থ হুগলী অধিকার করিলেন, চন্দননগর লুট করিলেন, কাটোয়া হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত শ্মশান করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। মারাঠারা হিন্দু-মুসলমান বিচার করিল না—বালক বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ ভেদ করিল না, যাহাকেই পাইল তাহাকেই হত্যা করিল।

বর্ষার শেষে মুর্শীদাবাদ হইতে বহু সৈন্য লইয়া, নবাব আলিবর্দ্দি বর্গীদের তাড়া করিলেন। মারাঠারা সম্মুখ যুদ্ধে ধরা না দিয়া বালেশ্বরের দিকে পলায়ন করিল ; সেখান হইতে ছোট নাগপুর, ছোটনাগপুর হইতে বিহার, বিহার হইতে মেদিনীপুর এমনি করিয়া ছুটাছুটি করিয়া আলিবর্দ্দির দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। ইতোমধ্যে রঘুজী বেরারে ফিরিয়া আসিলেন। ১৭৪৪ সালে তিনি বিশ হাজার বর্গীর সৈন্য ভাস্কর পন্থের অধীনে দিয়া, ওড়িষ্যায় পাঠাইয়া দিলেন। আলিবর্দ্দি ছুটিতে ছুটিতে ওড়িষ্যায় আসিলেন ; কিন্তু ভাস্করের হাতে তাঁহাকে রীতিমত নাজেহাল্ হইতে হইল। অবশেষে সন্ধির প্রার্থনা করিয়া আলিবর্দ্দি, ভাস্কর ও তাঁহার বাইশ জন

প্রধান অনুচরকে শিবিরে ডাকাইয়া আনিলেন এবং নিতান্ত নৃশংসভাবে হত্যা করাইলেন।

পর বৎসর রঘুজী ভোঁসলে নিজে বাঙ্গলায় আসিলেন এবং ভাস্কর-হত্যার প্রতিশোধ লইতে বাঙ্গলা দেশের পশ্চিমভাগে অকথ্য অত্যাচার করিতে লাগিলেন। ওড়িষ্যা মারাঠারা পুরাপুরি অধিকার করিয়া, মেদিনীপুরের চারদিক লুঠপাট করিতে লাগিল। মীর হবিব রঘুজীকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন। তিনি একদল বর্গী সৈন্য লইয়া কলিকাতার নিকট থানা দুর্গ অধিকার করিলেন*। এই সময়ই 'মহরাট্ট ডিচ্' (খাদ) তৈয়ারী হয়। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে এই সময়ই 'ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে'...ইত্যাদি ঘুম-পাড়ানী ছড়ার উৎপত্তি হয়। তারপর বর্গীরা আলিবর্দ্দির সঙ্গে গরিলা-যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে কাতর, অবসন্ন করিয়া তুলিল। কখনও কখনও মহারাষ্ট্রেরা হারিতে লাগিল বটে, কিন্তু সে পরাজয়ে তাহাদের উৎসাহ দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল। বর্গীরা বাঙ্গলার চতুর্দ্দিকে ভীষণভাবে লুণ্ঠন, হত্যা ও অগ্নিকাণ্ড বাধাইয়া দিল। অবশেষে নবাব আলিবর্দ্দি রঘুজী ভোঁসলেকে ওড়িষ্যা ছাড়িয়া দিতে ও বারো লক্ষ টাকা বাৎসরিক চৌথ দিতে সম্মত হইলেন।

---

* "বর্গীর হাঙ্গামা"—অধ্যাপক স্যার যদুনাথ সরকার। (প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৩৮)

১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে শাহুর মৃত্যু হয়। শাহুর ছেলে ছিল না বলিয়া তিনি ফত্তে সিং ভোঁসলেকে পোষ্য গ্রহণ করেন; তাঁহাকে পৈত্রিক জায়গীর ও সাহুর নিজস্ব সম্পত্তিতে বাহাল করিয়া,'আকালকোটের রাজা' বলিয়া স্বীকার করা হইল। তারপর দ্বিতীয় শিবাজীর পুত্র রাম রাজাকে মহারাষ্ট্রের ছত্রসম্বন্ত রাজা রূপে সাতারার সিংহাসনে বসাইয়া দেওয়া হইল; কিন্তু রাজার সমস্ত মন্ত্রন ও অষ্ট প্রধানদিগকে লইয়া পেশ্ ওয়া বালাজী পুনায় চলিয়া আসিলেন। তদবধি পুনা মহারাষ্ট্রের সত্যকার রাজধানী হইল। কোলাপুর, আকালকোট্ ও সাতারার তিনজন নামমাত্র রাজা কোনমতে টিকিয়া রহিলেন।

বালাজীর সময় ধাবাড়ের বংশধর যশোবন্ত গুজরাটের পশ্চিমভাগ, জিয়ুপা গায়কওয়াড় গুজরাটের পূর্বভাগ (বরোদা ও আহমেদাবাদ সমেত), সমগ্র মধ্যভারতের উত্তরার্দ্ধ রণজী সিন্ধিয়া, দক্ষিণার্দ্ধ মলহর রাও হোলকার এবং বেরার, নাগপুর, ছোট নাগপুর ও উড়িষ্যা রঘুজী ভোঁসলে—পেশওয়ার নামে শাসন করিতেছিলেন। খাশ্ মহারাষ্ট্র দেশ ছাড়া কর্ণাটের কতকাংশেও পেশ্ ওয়ার শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

পারস্য-সম্রাট নাদির শাহের মৃত্যুর পর, তাঁহার অধীন এক দুর্দ্ধান্ত আফগান সর্দার পারস্যের অনেকটা দখল করিয়া আফগানিস্থানের উত্তর পশ্চিমস্থ হীরাট নগরে স্বাধীন রাজা হইয়া বসিলেন। ইঁহার নাম আহম্মদ শাহ্ দুর্রাণী। তারপর সমগ্র আফগানিস্থানকে আয়ত্তাধীন করিয়া তিনি পঞ্জাব আক্রমণ

করেন এবং পঞ্জাবে এক শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া, রীতিমত খাজনা আদায় করিতে থাকেন। দুই বৎসর পরে তিনি পঞ্জাব পার হইয়া আসিয়া, কয়েক মাস ধরিয়া দিল্লী ও মথুরা নগরী লুণ্ঠন করেন এবং নাদিরশাহের মত বীভৎস হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করেন। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের তখন ভগ্নদশা; তিনি মুখ বুজিয়া একবার মারাঠার, একবার বিদেশী দস্যুসর্দ্দারের প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিতে লাগিলেন।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পেশ্ওয়ার ভ্রাতা রঘুনাথ রাও (ডাক নাম 'রাঘোবা') পঞ্জাবে গিয়া, আহম্মদ শাহ দুর্রাণীর প্রতিনিধিকে তাড়াইয়া দিয়া সমস্ত পঞ্জাবের মালিক হইয়া পড়িলেন। এ সময়ে ভারতবর্ষের প্রায় তিন চতুর্থাংশ মারাঠাদের হাতের মুঠার মধ্যে। আর এক চতুর্থাংশ হস্তগত করিতেও বোধ হয় তাঁহাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইত না। কিন্তু এমন কতকগুলি কারণ আসিয়া জুটিল, যাহাতে মহারাষ্ট্রের অদৃষ্টচক্র বিপরীত দিকে ঘুরিয়া গেল। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদ শাহ্ পঞ্জাবের বেশীর ভাগ পুনরুদ্ধার করিলেন; কিন্তু মারাঠা ও পঞ্জাবীয়া তাঁহার সৈন্যদলের পশ্চাৎ ভাগ আক্রমণ করিয়া, তাঁহাকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করিল।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে বহু সহস্র সৈন্য লইয়া আহম্মদ শাহ্ দুর্রাণী মারাঠাদের দর্প চূর্ণ করিতে আসিলেন। মারাঠারাও চতুর্দ্দিক হইতে প্রায় দুইলক্ষ সৈন্য যোগাড় করিয়া

পানিপথের সুপ্রশস্ত মাঠে আড্ডা করিতে লাগিল। পেশওয়ার ভাই রঘোবা এই যুদ্ধে সেনাপতিত্ব করিতে অস্বীকার করিলেন; কাজেই বালাজীর আঠারো বৎসরের পুত্র বিশ্বাস রাওকে এই বিশাল যোদ্ধৃদলের সেনাপতি হইতে হইল। অমাত্য সদাশিব রাও ভাও, বিশ্বাসরাওয়ের পরামর্শদাতা ও সহকারী হইয়া রহিলেন। কিন্তু সামরিক বিষয়ে পরামর্শ দিবার বা সৈন্য-চালনা করিবার অভিজ্ঞতা সদাশিবের কিছুই ছিল না।

পানিপথে যাইবার পথে মারাঠা সৈন্যগণ দিল্লী অধিকার করিয়া কিছু সময় ও শক্তি নষ্ট করিয়া গেল। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী ভোরে আহম্মদ শাহ্ দুর্রাণীর সহিত সংগ্রাম বাধিল। বর্গীর অশ্বারোহীগণ দুর্রাণীর কাবুলি সৈন্যদিগকে, ক্রমাগত ছয়ঘণ্টা কাল অদ্ভুত বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া, রীতিমত কাবু করিয়া ফেলিল। এদিকে মারাঠাদের শিবিরে এতগুলি সৈন্যের খাদ্য ও জলের অভাব হইল। বিশ্বাসরাও ক্ষুধার্ত বর্গীরদিগকে শিবিরে ফিরাইয়া আনিয়া, পদাতিক সৈন্যদিগকে আগাইয়া লইয়া চলিলেন। এমন সময় আহম্মদ একদল নূতন সৈন্য লইয়া প্রবল বেগে মারাঠাদিগকে আক্রমণ করিলেন। দুই ঘণ্টা কাল ঘোরতর যুদ্ধের পর কেহ কাহাকেও হঠাইতে পারিল না।

বৈকাল বেলা বিশ্বাস হঠাৎ সাংঘাতিক আহত হইয়া ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেলেন। মারাঠারা উৎসাহহারা হইল। সদাশিব তাহাদিগকে সম্মুখ দিকে চালনা করিতে চেষ্টা করিলেন;

কিন্তু সৈন্যগণ উপযুক্ত নেতার অভাবে পিছনে হটিতে লাগিল। বর্গীর সৈন্যগণ তখন শিবিরে ছিল, তাহারা বিশ্বাসরাওয়ের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া আগেভাগেই ঘোড়া ছুটাইয়া পলাইতে লাগিল। এদিকে দুর্রাণী তিনদিক হইতে মারাঠী পদাতিকগণকে ঘেরিয়া, হত্যার বিভীষিকা লাগাইয়া দিলেন। ষোলো মাইল পর্য্যন্ত তাহারা মারাঠাদিগকে মারিতে মারিতে হঠাইয়া আনিয়া, ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল। বিশ্বাসও, সদাশিব এবং সাতাশ জন সেনাপতি এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন। সাধারণ সৈন্যের মৃত্যু সংখ্যা অন্ততঃ লাখ্খানেক হইবে।

তৃতীয় পাণিপথের এই যুদ্ধই মহারাষ্ট্রদের মেরুদণ্ড জন্মের মত ভাঙ্গিয়া দিল। বৃদ্ধ মলহর রাও হোল্কার যুদ্ধের গোড়াতেই আপন সৈন্য লইয়া সরিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি যদি যুদ্ধে সর্বান্তঃকরণে যোগ দিতেন ও রাঘোবা নিজে সৈন্য-পরিচালন করিতেন, তাহা হইলে বোধহয় মারাঠাদের এমন পরাজয়ের কালিমা সর্বাঙ্গে লেপন করিতে হইত না। তদুপরি উত্তর-ভারত-প্রবাসী রোহিলাগণ ও অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা, আহম্মদ শাহ্কে সাহায্য না করিলে, বোধ হয় ইতিহাসের ধারা এমন ভাবে বদ্লাইয়া যাইত না। যাহা হউক, ইহার ফলে সমগ্র ভারতে মারাঠার রাজত্ব-বিস্তারের আশা নির্ম্মূল হইল। মুঘল ও মারাঠার এই দুর্বলতার সুযোগে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে এক তৃতীয় শক্তি ভারতের নাট্যমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করিল ;—সে ইংরাজ।

পঞ্চম অধ্যায়

জীবন-সন্ধ্যায়

চতুর্থ পেশ্‌ওয়া—মাধবরাও

পাণিপথের যুদ্ধের ছয় মাস পরেই পেশ্‌ওয়া বালাজী ভগ্নহৃদয়ে মৃত্যু-বরণ করিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সতেরো বৎসর বয়স্ক মাধবরাও এই শোকাচ্ছন্ন জাতির নায়ক নির্বাচিত হইলেন।

ইতঃপূর্ব্বে নিজাম-উল্‌-মুল্কের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার পুত্র নাজির জঙ্গের সহিত মারাঠাদের সন্ধির ফলে বিজাপুরের অনেকাংশ তাঁহার অধিকারে আসিয়াছে। কাজেই নিজাম-রাজ্য বেশ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতেছে। ইতঃপূর্ব্বে কর্ণাটের মধ্যস্থলে মহীশূরে একজন হিন্দু রাজা একটি মাঝারী গোছের রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন; হায়দার আলি নামে মহীশূরের এক মুসলমান্ কর্ম্মচারী তাঁহার হিন্দুপ্রভুকে তাড়াইয়া দিয়া, নিজেই সুলতান হইয়া বসিয়াছেন। তাহা ছাড়া পূর্ব্ব-কর্ণাটে আর্কট নামক স্থানকে কেন্দ্র করিয়া আর একটি ছোট মুসলমান রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সকল মুসলমান রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব লইয়া ফরাসী ও ইংরাজ বণিকদলে রীতিমত টক্কর লাগিয়াছে। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, ইংরাজ বণিকদলের রাজ্যের লোভ বেশ বাড়িয়া

গিয়াছে। দূর হইতে মহারাষ্ট্র দেশের উপরও তাঁহারা সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইতেছেন। পশ্চিম-গুজরাট ধাবাড়েদের হস্তচ্যুত হইয়াছে; এখন কেবল বরোদায় গায়কওয়াড়, গোয়ালিয়রে সিন্ধিয়া, ইন্দোরে হোল্‌কার ও মধ্যপ্রদেশে সিন্ধিয়ার বংশ পুরুষানুক্রমে পেশ্‌ওয়ার প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারাও পেশ্‌ওয়াকে রীতিমত কর দেন্ না, তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করেন না, নিজেদের মধ্যে প্রাধান্য লইয়া সর্ব্বদা ঝগড়া-ঝাঁটি করিতেছেন।

বালক মাধব রাও এই দুর্দ্দিনে যে ভাবে জাতির মধ্যে উৎসাহ ও ঐক্য আনিবার চেষ্টা করিলেন, তাহা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। তাঁহার কাকা রাঘোবা তাঁহাকে হাতের পুতুল করিয়া নিজেই সমস্ত ক্ষমতা আত্মসাৎ করিতে চাহিতেছিলেন, তিনি তাহা নিবারণ করিলেন। হায়দার আলি মহারাষ্ট্রের দক্ষিণাংশ অধিকার করিবার চেষ্টা করায়, তিনি দুই-দুইবার তাঁহাকে ভীষণ-ভাবে পরাজিত করিয়া, ৩২ লক্ষ টাকা খেসারৎ আদায় করিলেন। মাধবরাও ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবে ও রাজপুতানায় একদল প্রকাণ্ড মারাঠা সৈন্য পাঠাইয়া, বহু জাঠ ও রাজপুত জেলা হইতে কর আদায়ের বন্দোবস্ত করিলেন। তারপর মারাঠাগণ দিল্লী অধিকার করিয়া, সাহ আলমকে সিংহাসনে বসাইল এবং সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের মতো তাঁহাকে কথায় কথায় ওঠ্‌-ব'স্ করাইতে লাগিল। ইহার পর পাণিপথে শত্রুতাচরণের শোধ তুলিতে, তাহারা যোগ্‌রা নদী পার হইয়া রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিল।

রোহিলারা লক্ষ লক্ষ টাকার চৌথ দিয়াও মারাঠার নির্মম অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইল না। অতঃপর মারাঠারা অযোধ্যার নবাবের রাজ্য ছার্ খার দিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় মাধব রাওয়ের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া তাহারা বিষণ্ণচিত্তে দেশে ফিরিয়া আসিল।

পঞ্চম পেশ্ওয়া—নারায়ণ রাও
ষষ্ঠ পেশ্ওয়া—মধুরাও নারায়ণ

১৭৭২ খৃষ্টাব্দের শেষে মাধবের মৃত্যুর পর তাঁহার আঠারো বৎসরের ভাই নারায়ণ রাও পেশওয়ার পদে বসিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই ক্ষমতালোভী রঘুনাথ বা রাঘোবা তাঁহাকে ষড়যন্ত্র করিয়া হত্যা করাইলেন এবং নিজেকে পেশ্ওয়া বলিয়া রটনা করিলেন। কিন্তু নারায়ণ রাওয়ের বিধবা পত্নী এই সময় এক পুত্র প্রসব করায়, অমাত্যগণ এই শিশুকেই প্রকৃত পেশ্ওয়া বলিয়া প্রচার করিলেন। দুইটি দল হইয়া গেল; একদল নারায়ণের শিশুপুত্র মধুরাওয়ের পক্ষে, অন্যদল রাঘোবার পক্ষে। কিন্তু রাঘোবার দল অত্যন্ত পাৎলা হওয়ায়, তিনি ইংরাজদের সাহায্য চাহিতে সুরাটের দিকে চলিয়া গেলেন। নানা ফড্‌নবীশ নামক একজন সহকারী-অমাত্য, শিশু মধুরাও নারায়ণকে সিংহাসনে বসাইয়া, তাঁহার নামে রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। নানা ফড্‌নবীশ ছিলেন ঘোর ইংরাজ-বিদ্বেষী, অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ও শিক্ষিত রাজনৈতিক।



মাধোজী সিন্ধিয়া



নানা ফার্ণাবীশ

এদিকে রঘুনাথ রাও সুরাটে আসিয়া, ইংরাজদের সহিত এক সন্ধি করিলেন। সন্ধির সর্ত্ত হইল—ইংরাজগণ রঘুনাথকে পেশ্ওয়া পদে বসাইতে সাহায্য করিবেন এবং তাহার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহারা বেসিন বন্দর, সল্‌সিট্ ও বোম্বাইয়ের চারিদিকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ পাইবেন। গায়কওয়াড়্ রঘুনাথের পক্ষ লইলেন; সিন্ধিয়া ও হোল্‌কার মধুরাওয়ের পক্ষ লইলেন। দুইদলে মারামারি বাধিয়া উঠিল। এমন সময় একদল ইংরাজ সৈন্য রাঘোবাকে লইয়া পুনার দিকে অগ্রসর হইল। পুনার তেরো মাইল দূরে ওয়ার্গাঁওয়ে মারাঠাগণ যুদ্ধে ইংরাজ-সৈন্যকে ভীষণভাবে হারাইয়া দিল। অবশেষে তাহারা মাথা হেঁট্ করিয়া নানা ফড়্‌নবীশের সঙ্গে এক সন্ধি করিল। সন্ধির সর্ত্ত রহিল যে, ইংরাজরা রাঘোবার পক্ষ পরিত্যাগ করিবেন এবং মহারাষ্ট্রের দ্বীপগুলি ফিরাইয়া দিবেন। কিন্তু বৃটিশ সৈন্য বোম্বাইয়ে ফিরিয়া গিয়া, এই সন্ধির সর্ত্ত হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন এবং নূতন করিয়া যুদ্ধ করিবার উদ্যোগ-আয়োজন করিতে লাগিলেন।

বুন্দেলখণ্ড হইতে জেনারেল গডার্ড্ এক প্রকাণ্ড বাহিনী লইয়া সুরাটে আসিয়া পৌঁছিলেন। গায়কওয়াড়ের সহিত ইংরাজের এক পারস্পরিক মিত্রতাসূচক সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। গায়কওয়াড়্ ও ইংরাজের মিলিত সৈন্যদল আহ্‌মদাবাদ ও বেসিন অধিকার করিয়া, পুণার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। নানা ফড়্‌নবীশের দল ইংরাজদিগের উপর ভীম

অ্যাক্রোশে পতিত হইয়া, তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল। ইংরাজ পক্ষের প্রায় ৫০০ সেনা হত হইল ; কয়কটি কামান ও বহু রসদ মারহাটারা লুঠিয়া লইল।

ওদিকে পপ্‌হাম নামক আর একজন ইংরাজ সেনানায়ক হঠাৎ গোয়ালিয়র আক্রমণ করিয়া, রাজধানীর দুর্ভেদ্য দুর্গটি বহু কষ্টে হস্তগত করিলেন। মাধবজী (মাধোজী) সিন্ধিয়া তখন বাধ্য হইয়া ইংরাজদের সহিত একটা পৃথক সন্ধি করিলেন।

উভয় পক্ষের এই হারজিতের পর সাল্‌বাই নামক স্থানে এক সন্ধি হইল। সন্ধির ফলে ইংরাজগণ মহারাষ্ট্রীয়দের সমস্ত স্থান ফিরাইয়া দিলেন এবং রাঘোবার পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন : রাঘোবা তিন লক্ষ টাকা করিয়া বাৎসরিক বৃত্তি পাইবেন—স্থির হইল।

মাধবজী সিন্ধিয়া ইংরাজদের সহিত বন্ধুত্ব বজায় রাখিয়া আবার নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি দিল্লীর বাদ্‌শা শাহ্‌ আলমকে হাতের মুঠার মধ্যে আনিয়া, স্বয়ং তাঁহার সেনাপতি হইলেন এবং পেশ্‌ওয়ার জন্য উজীরী সনন্দ আদায় করিয়া লইলেন। সিন্ধিয়ার চেষ্টায়ই পুনায় একজন ইংরাজ দূত রাখিবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। একজন ফরাসী সেনাপতির অধীনে সিন্ধিয়ার ত্রিশ হাজার সৈন্য ইউরোপীয় যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছিল। সিন্ধিয়া ইন্দোর রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং রাজপুত শক্তিকেও যথেষ্ট খর্ব্ব করিয়া ছাড়িয়াছিলেন। এই সময় মল্‌হররাও হোল্‌কারের

বিধবা পুত্রবধূ পুণ্যবতী অহল্যাবাঈ বিশেষ যোগ্যতার সহিত ইন্দোর শাসন করিতেছিলেন। সিন্ধিয়ার এত ক্ষমতাবৃদ্ধি দেখিয়া ইংরাজরা ভীত হইয়া পড়িলেন। যাহা হউক, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে মাধবজীর মৃত্যুতে ইংরাজরা অনেকটা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

এদিকে পুনার নানা ফড়নবীস, মধুরাও নারায়ণের অভিভাবকরূপে, বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইংরাজরা একদল সৈন্য রাখিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, ফড়নবীশ পুনায় তাহা অগ্রাহ্য করেন। তারপর মহীশূরের ক্ষমতাশালী সুলতান টিপুর বিরুদ্ধে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ যখন যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন নানা ফড়নবীশ একদল মারাঠা সৈন্য তাঁহার সাহায্যে পাঠাইয়াছিলেন। টিপুর রাজ্য কাড়িয়া লইয়া, ইংরাজগণ উহার এক তৃতীয়াংশ মারাঠাদিগকে প্রদান করিলেন।

ইহার পর নানা ফড়নবীশ, সিন্ধিয়া ও হোলকার রাজ্যের সাহায্য লইয়া, নিজাম-রাজ্য আক্রমণ করেন। নিজাম ইংরাজদের মিত্র ছিলেন; বিপদে পড়িয়া তিনি ইংরাজের পুনঃ পুনঃ সাহায্য চাহিয়াও পাইলেন না। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে নিজাম মারহাট্টাদের হাতে গুরুতররূপে হারিয়া গিয়া, প্রকারান্তে তাহাদের তাঁবেদার হইয়া রহিলেন।

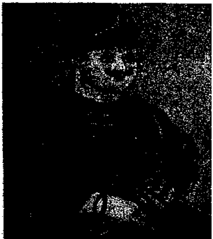
নানা ফড়নবীশের কঠোর শাসনে মহারাষ্ট্রের বাহিরে গৌরব বৃদ্ধি ও ভিতরে শৃঙ্খলা আসিল। কিন্তু পেশওয়া মধুরাও নারায়ণ যৌবন বয়সেও নানা ফড়নবীশের খেলার পুতুল হইয়া থাকা অসহ্য বোধ করিলেন। একদিন ফড়নবীশ মধুরাওকে

বারংবার-নাই তিরস্কার করায়, মনের দুঃখে তিনি আত্মহত্যা করিলেন। ইহাতে নানা ফড়্নবীশের শোক-দুঃখের আর অবধি রহিল না; সত্যই তিনি পেশ্ওয়াকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন।

সপ্তম পেশ্ওয়া—দ্বিতীয় বাজীরাও

ইহার পর ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথের পুত্র (দ্বিতীয়) বালাজী বাজীরাও পেশ্ওয়া পদ লাভ করিলেন; নানা ফড়্নবীশ প্রথমটা কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরে তিনি দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নানার মৃত্যু হইল। ইহার পর মারাঠার সৌভাগ্য-রবি দ্রুত অস্তাচলগামী হইল।

দ্বিতীয় বাজীরাও অনেকটা 'বাপ্‌কা বেটা' বটেন; তাঁহার মত অপদার্থ কাপুরুষ পেশ্ওয়া মহারাষ্ট্রের মাটিতে আর জন্ম-গ্রহণ করে নাই। এই সময় মহারাষ্ট্রে ভীষণ অরাজকতা দেখা দিল। দুর্বুদ্ধি দ্বিতীয় বাজীরাও যশোবন্ত রাও হোল্‌কারের ভ্রাতাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করায়, যশোবন্ত রাও ক্রুদ্ধ হইয়া সসৈন্যে পুণা অধিকার করিলেন; পেশ্ওয়া তাঁহাকে বাধা দিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। যশোবন্ত নিজের খুশীমত বাজীর ছোট ভাই অমৃতরাওকে পেশ্ওয়ার আসনে বসাইয়া দিলেন। বাজীরাও হোল্‌কারের ভয়ে পলাইয়া গিয়া ইংরাজের শরণাপন্ন হইলেন। বেসিনে ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার এক



নানা সাহেব।



ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ।

[মহারাষ্ট্র]

হীন সন্ধি হইল। সন্ধির সর্ত্ত রহিল এইরূপ যে, বাজীরাও পেশওয়া পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে, ইংরাজের অধীন একজন মিত্র বলিয়া গণ্য হইবেন; পুনায় তিনি একদল বৃটিশ সৈন্ত পোষণ করিবেন এবং ঐ সৈন্তের ভরণ-পোষণের জন্ত ২৬ লক্ষ টাকা আয়ের ভূ-সম্পত্তি ইংরাজদের নিকট গচ্ছিত রাখিবেন।

একদল ইংরাজ সৈন্তের সাহায্য পাইয়া দ্বিতীয় বাজীরাও পুণায় ফিরিয়া আবার নিজের গদীতে বসিলেন। কিন্তু সিন্ধিয়া, হোল্‌কার প্রভৃতি অন্তান্ত মারাঠা নায়কেরা পেশওয়ার এই হীনতায় যথেষ্ট অপদস্থ বোধ করিলেন; এবং বেসিনের সন্ধি-পত্রের সর্ত্ত তাঁহাদিগকে মানিয়া চলিতে বলা হইলে, তাঁহারা একই সময়ে ইংরাজদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার ধরিলেন। জেনারেল সার আর্থার ওয়েলেস্‌লি আসাই ও আঁর্গাওয়ের যুদ্ধে এবং জেনারেল লেক্ দিল্লী ও লাসোয়ারীর যুদ্ধে—গায়কওয়াড়, সিন্ধিয়া ও ভোঁস্‌লার মাথা নত করিলেন। তাঁহারা নিজ নিজ রাজ্যের কতকাংশ ইংরাজদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া, বাকী অংশে করদ রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইলেন।

কিন্তু হোল্‌কার তখনও পৃথক থাকিয়া বৃটিশ শক্তিকে তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিতেছিলেন। কর্ণেল মন্‌সনের সেনাদলকে মথুরা ও আগ্রায় তিনি নাকালের একশেষ করিয়া ছাড়িয়াছিলেন। অবশেষে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে দীঘ্‌নগরের (ভরতপুরের নিকট) যুদ্ধে হোল্‌কার পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। ভরতপুরের সামন্ত রাজা হোল্‌কারের সহিত যোগ দিয়াছিলেন বলিয়া, ইংরাজরা

তাঁহার রাজধানীও আক্রমণ করিলেন ; কিন্তু ভরতপুরের অজেয় দুর্গ কোন কৌশলেই হস্তগত করিতে না পারিয়া, রাজার সহিত সন্ধি করিলেন। পরে হোল্‌কারের অধিকারের অধিকাংশ রাজ্য গ্রাস করিয়া, ইংরাজগণ বাকী সামান্য অংশে হোল্‌কারকে করদ রাজারূপে থাকিতে দিলেন। এই দ্বিতীয় প্রস্থ মারাঠাযুদ্ধের ফলে ইংরাজদের ভারতে প্রভুত্ব-স্থাপনের পথ-পরিষ্কার হইল।

পেশ্‌ওয়া দ্বিতীয় বালাজীর ক্রমে ক্রমে সুবুদ্ধির উদয় হইল,—কিন্তু বড় দেরীতে। ইংরাজদের রাজ্য-লোভ সাংঘাতিক রকমের বাড়িতেছে দেখিয়া তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ইংরাজরা তাঁহাকে কঙ্কন প্রদেশ ও কয়েকটি দুর্গ ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করায়, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইহাদের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার নিকট তাঁহারও নিস্তার নাই। বালাজী গোপনে তাহাদিগকে স্বদেশ হইতে উচ্ছেদ করিতে মনস্থ করিলেন। ২৬ হাজার মারাঠা সৈন্য একদিন কিকীর রণক্ষেত্রে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিল (১৮১৮ খৃষ্টাব্দ)। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী বিরূপ। পেশ্‌ওয়া পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইলেন। সমগ্র মহারাষ্ট্র-ভূমি ইংরাজদের অধিকারে আসিল। দ্বিতীয় বালাজীরাও আট লক্ষ টাকার বৃত্তি পাইয়া, কাণপুরের নিকট বিঠুরে নজরবন্দী হইয়া, বাকী জীবনটুকু কাটাইলেন।

আপ্পা সাহেব ভোঁস্‌লা পুনরায় স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু নাগপুর ও সীতাবলদীর যুদ্ধে তাঁহারা আশাতরুও চিরতরে নির্ম্মূল হইয়া গেল। ১৮৫৩

খৃষ্টাব্দে অপুত্রক অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হওয়ায়, তাঁহার ক্ষুদ্র রাজ্যটি ইংরাজরা খাস্‌ করিয়া লইলেন। এইরূপে শিবাজী—স্বাধীনতার যে যজ্ঞকুণ্ড একদিন ভৈরব তেজে জ্বালাইয়া গিয়াছিলেন, তাহা দুইশত বৎসরের মধ্যে গৃহ-বিবাদের অজস্র বারিপাতে নির্বাপিত হইয়া গেল।

তারপর ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে আর একবার মহারাষ্ট্র জাতির মধ্যে স্বাধীনতা-লাভের একটু সাড়া জাগিয়াছিল। কিন্তু সকলের মধ্যে নয় এবং ভালো করিয়াও নয়। ঐ সালে সমগ্র উত্তর ও মধ্য ভারত ব্যাপিয়া যে প্রকাণ্ড সিপাহী-বিদ্রোহ হয়, তাহার মোটামুটি বিবরণ তোমরা স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে পড়িয়াছ; বড় হইয়া বিস্তৃত ইতিহাস পড়িয়া দেখিয়ো। এই বিদ্রোহের অগ্নি যাঁহারা জ্বালাইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই মহারাষ্ট্র জাতীয়। ইঁহাদের মধ্যে নানা সাহেব ছিলেন প্রধান। দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের পুত্র ছিলেন এই নানা সাহেব। বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর ইংরাজ কোম্পানী তাঁহার পুত্র নানা সাহেবকে কোনরূপ বৃত্তি দিতে চাহিলেন না দেখিয়া, নানা-সাহেবের হইল ইংরাজদের উপর ভীষণ জাতক্রোধ। তিনি তলে তলে দেশীয় সিপাহীদিগকে ইংরাজের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিতে লাগিলেন। তাঁহারই পরামর্শে নাকি কানপুরে নানা বয়সের শত শত ইংরাজ স্ত্রী-পুরুষকে উত্তেজিত সিপাহীরা নিষ্ঠুরভাবে খুন করিয়া ফেলিয়াছিল। সিপাহী-বিদ্রোহ দমন হইয়া গেলে, নানা সাহেবকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

এই সূত্রে আর একজনের নাম না করিলে চলিবে না।

তিনি ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ। ইনি ছিলেন ঝাঁসীর রাজা গঙ্গাধর রাওএর পত্নী; বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই ইনি অপুত্রক অবস্থায় বিধবা হন্। গঙ্গাধরের মৃত্যুর পর ইংরাজ শাসনকর্তা লর্ড ড্যালহাউসি রাণী লক্ষ্মীবাঈকে পোষ্যপুত্র রাখিতে না দিয়া, ঝাঁসী রাজ্য জোর করিয়া কাড়িয়া লন্। বিধবা রাণীর কোন আপত্তি টিকে নাই; জোর-জবরদস্তিতেও তিনি ইংরাজের সহিত পারিলেন না। সেই জন্য তিনিও পরম শত্রুরূপে সিপাহী-বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিলেন। একদল বিদ্রোহী সিপাহী লইয়া ইনি নিজে ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধে নামিলেন। তাঁহার অদ্ভুত সাহস, অদম্য তেজ ও যুদ্ধ-চালনা করিবার অপূর্ব্ব কৌশল দেখিয়া শত্রুপক্ষও স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। যুদ্ধ করিতে করিতেই এই বীর নারীর মৃত্যু হয়। তাঁহার বয়স তখন কুড়ি বৎসর মাত্র। সিপাহী-বিদ্রোহের আর একজন বড় নেতা ছিলেন তান্তিয়া টোপী। তিনিও একজন মারাঠী ব্রাহ্মণ।

যাহাহউক, একশত বৎসরের উপর ইংরাজদের অধীনে আসিয়া, মারাঠা জাতি একেবারে নির্বীর্য্য, পঙ্গু হইয়া যায় নাই। ইংরাজ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে যে নূতন শিক্ষা ও সভ্যতার প্রদীপ জ্বালাইয়া দিয়াছেন, তাহার আলোক মুক্ত করিয়া তাহারা স্বাধীনতার পড়া সুরু করিয়াছে। গত পঁচাত্তর বৎসরের মধ্যে মহারাষ্ট্র, রাণাডে, তিলক, গোখলে, কেল্কার, দেশপাণ্ডে, খাপর্দের মত বহু সুসন্তানরত্নকে [illegible] নিজে ধন্য হইয়াছে—ভারতকে ধন্য করিয়াছে।